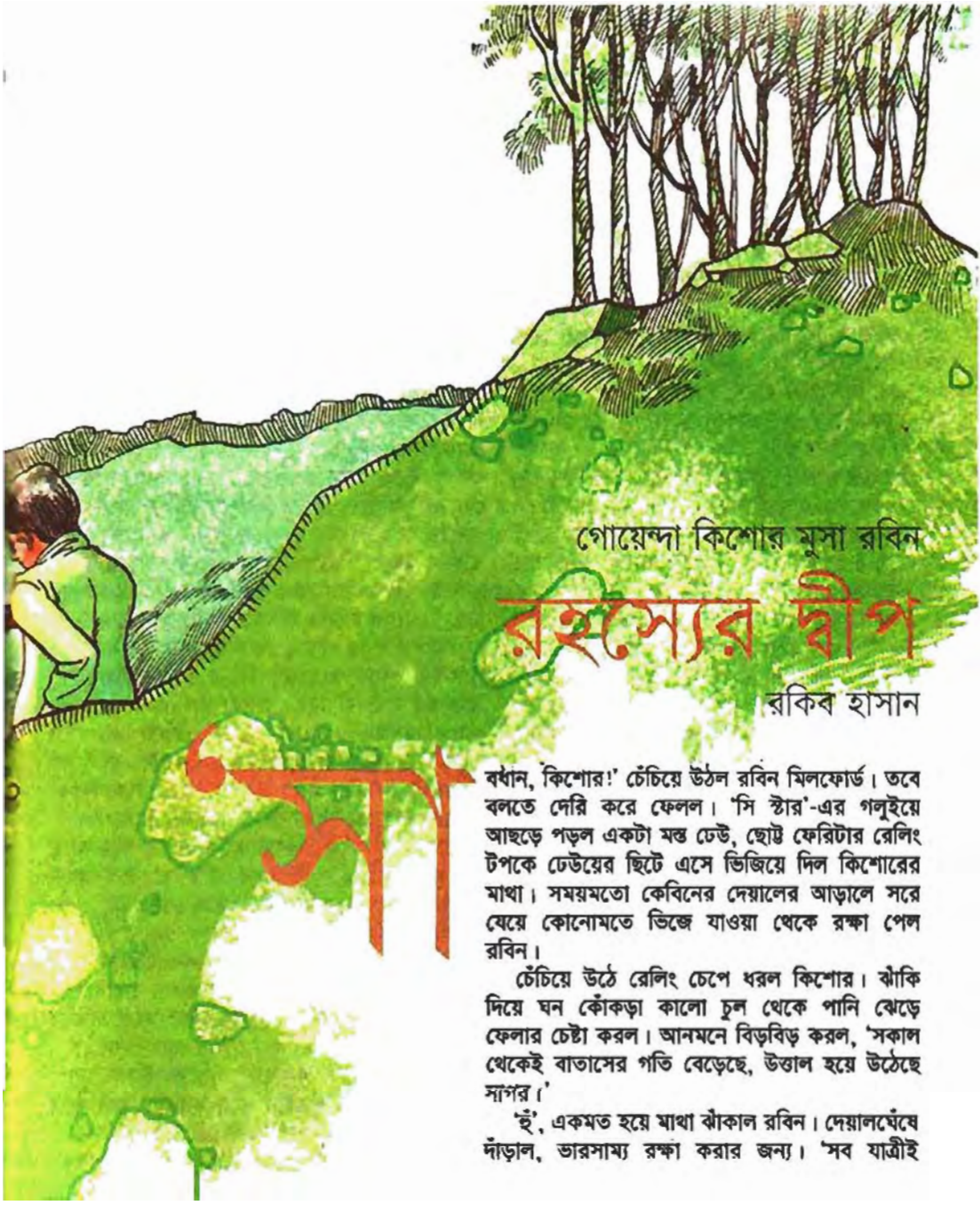

গোয়েন্দা কিশোর মুসা রবিন

রহস্যের দ্বীপ

রকিব হাসান

সাবধান, কিশোর!' চেঁচিয়ে উঠল রবিন মিলফোর্ড। তবে বলতে দেরি করে ফেলল। 'সি স্টার'-এর গলুইয়ে আছড়ে পড়ল একটা মস্ত ঢেউ, ছোট্ট ফেরিটার রেলিং টপকে ঢেউয়ের ছিটে এসে ভিজিয়ে দিল কিশোরের মাথা। সময়মতো কেবিনের দেয়ালের আড়ালে সরে যেয়ে কোনোমতে ভিজে যাওয়া থেকে রক্ষা পেল রবিন।

চেঁচিয়ে উঠে রেলিং চেপে ধরল কিশোর। ঝাঁকি দিয়ে ঘন কোঁকড়া কালো চুল থেকে পানি ঝেড়ে ফেলার চেষ্টা করল। আনমনে বিড়বিড় করল, 'সকাল থেকেই বাতাসের গতি বেড়েছে, উত্তাল হয়ে উঠেছে সাগর।'

'হুঁ', একমত হয়ে মাথা ঝাঁকাল রবিন। দেয়ালঘেঁষে দাঁড়াল, ভারসাম্য রক্ষা করার জন্য। 'সব যাত্রীই

কেবিনের ভেতরে রয়েছ, খেয়াল করেছ কি না জানি না। নোনা পানির ছিটে ভালো লাগে না কারোরই।'

'আমার কিন্তু ভালোই লাগছে, রবিন, মজা পাচ্ছি', গায়ের লাল রঙের প্লাস্টিকের পঞ্চো থেকে হাত দিয়ে পানি ঝাড়তে ঝাড়তে বলল : 'চারপাশে কুয়াশা, মুখে নোনা পানির ছিটে, প্রবল ঢেউ কেটে এগিয়ে চলা—দারুণ, দারুণ!' চারপাশে তাকাল ও। 'মুসা কই? এ রকম একটা পরিবেশ মিস করা উচিত নয় ওর।'

'কেবিনে শুয়ে আছে', রবিন জানাল। 'সকালে নাশতার সময় অতিরিক্ত খেয়ে ফেলেছিল। ভরাপেটে এই ঢেউয়ের দুলুনি সইতে পারছে না। অসুস্থ বোধ করছে ও।'

'চলো তো দেখি কতখানি খারাপ', বলে কেবিনের বড় দরজাটার দিকে এগোল কিশোর। ঠেলা দিয়ে খুলল।

নীল আর ধূসর রং করা কেবিনটাতে অন্তত ৫০ জন মানুষের বসার ব্যবস্থা আছে, দেখে অনুমান করল কিশোর। কিন্তু কাঠের বেঞ্চগুলো এখন বেশির ভাগই খালি। মাত্র ১২ জন লোক ক্যানারি আইল্যান্ডে চলেছে এই কুয়াশাচ্ছন্ন দিনে।

একটা বেঞ্চে লম্বা হয়ে পড়ে থাকতে দেখা গেল মুসা আমানকে। চোখ বোজা। দেখেই বোঝা যায়, অবস্থা ভালো নয় ওর। 'কী অবস্থা, মুসা?' ওর কাছে এসে জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'ভালো', গুঙিয়ে উঠে দুর্বল কণ্ঠে জবাব দিল মুসা। 'পৌঁছাতে আর কতক্ষণ লাগবে?'

'আধঘণ্টা', রবিন বলল। 'মেইনি উপকূল থেকে ক্যানারি আইল্যান্ডের দূরত্ব ১৫ মাইলের বেশি হবে।'

'অতক্ষণ বেঁচে থাকতে পারব না আমি', জবাব দিল মুসা।

'পরেরবার সাগর পাড়ি দিতে গেলে তোমাকে প্রথমেই মনে রাখতে হবে, বেশি খাওয়া চলবে না', রবিন বলল। নোনা পানিতে ভিজে কপালে লেপ্টে থাকা বাদামি চুলের গোছা সরিয়ে দিল। মুসার মুখোমুখি আরেকটা বেঞ্চে বসে সহানুভূতির দৃষ্টিতে ওর কৃষ্ণাঙ্গ নিগ্রো বন্ধুর দিকে তাকাল কিশোর।

'পারবে, মুসা', সাহস দিল সে, 'চুপচাপ পড়ে থাকো। বিশ্রাম নাও। শিগগিরই এই বোট থেকে নেমে তোমার এমিলি আন্টির বাড়িতে যেতে পারবে, পুরো একটা সপ্তাহ ছুটির আনন্দ ভোগ করতে পারবে। বনের ভেতর বেড়ানো, যত ইচ্ছে তাজা গলদা চিংড়ি খাওয়া...'

'থাক থাক, প্লিজ', কঁকিয়ে উঠে বাধা দিল মুসা, 'খাবারের কথা আর মনে করিয়ো না।'

'তবে যা-ই বলো, মুসা', রবিন বলল, 'তোমার এমিলি আন্টি তাঁর বাড়িটাতে আমাদের থাকতে দিয়ে বড়ই উপকার করেছেন—যদিও বাড়িটা খালিই পড়ে ছিল—কিন্তু যতই খালি থাক, কে কার বাড়িতে বিনে ভাড়ায় এক সপ্তাহ থাকতে দেয়, বলো?' এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে জিজ্ঞেস করল, 'তিনি কবে আসবেন?'

'আন্টি এখন ক্যানারিতে প্রায় আসেই না', মুসা জবাব দিল। 'শহরে নিজের কাজ নিয়েই ব্যস্ত থাকতে হয়। বাড়িটা থেকে তাঁর ভালো আয় হয়—মানে হতো—এ বছর বিশেষ সুবিধে হচ্ছে না।'

'ভাড়াটে পাচ্ছেন না কেন বুঝতে পারছি না', কিশোর বলল, 'না পাওয়ার তো কোনো কারণ নেই। মেইনি উপকূলের সবচেয়ে সুন্দর দ্বীপ ক্যানারি আইল্যান্ড। গরমের সময় তো শুনেছি এত বেশি ট্যুরিস্ট আসে, থাকার জায়গা পায় না।'

'তা ঠিক', মুসা বলল। 'তবে এ বছর দুজন ভাড়াটে বুকিং দিয়েও পরে ক্যানসেল করেছে...' আবার একটা জোরালো ঢেউ বোটের গায়ে আঘাত হানতেই 'আউফ্' করে উঠে দুই হাতে মুখ ঢাকল ও।

কেবিনের চারপাশে তাকিয়ে কিশোর দেখল আর কেউ মুসার মতো অসুস্থ হয়ে পড়েছে কি না। একটা পরিবারকে দেখা গেল, সঙ্গে চারটে ছোট ছোট ছেলেমেয়ে, বেঞ্চে বসে খেলছে। মা বসে বই পড়ছে, বাবা জানালা দিয়ে বাইরের সাগরের দিকে তাকিয়ে আছে, শান্ত ভঙ্গিতে। ওদের কয়েক সারি সামনে বসে কমলা খাচ্ছে ধূসর চুলওয়ালা দুজন বয়স্ক দম্পতি। বোটের দুলুনিতে ওদের কোনো অসুবিধে হচ্ছে না। বোটের পেছনে বসা দুজন এশিয়ান, একজন পুরুষ, একজন মহিলা। পরস্পরের হাত ধরে রেখেছে, মাঝে মাঝেই মুখ ফিরিয়ে তাকাচ্ছে একজন আরেকজনের দিকে, চোখের দিকে। হানিমুনে বেরিয়েছে বোধহয়।

দরজার কাছে বসেছে কেবিনের বাকি দুজন যাত্রী। স্যুট-টাই পরা, ব্যবসায়ী কিংবা কোনো অফিসের উচ্চপদস্থ কর্মচারী হবে। কালো চুলওয়ালা লোকটার চোখে চশমা, কোলের ওপর একটা ল্যাপটপ কম্পিউটার নিয়ে কাজ করছে। খসখসে, বালি রং চুলওয়ালা লোকটা অস্থির ভঙ্গিতে বেঞ্চে টোকা দিচ্ছে, বারবার তাকাচ্ছে নিজেদের ব্যাগগুলোর দিকে।

'দেখে মনে হচ্ছে, জীবনে এই প্রথমবার শহর ছেড়ে বাইরে বেরিয়েছে', ফিসফিস করে রবিনকে বলল কিশোর। 'ভাবছি, ক্যানারিতে যাচ্ছে কেন?'

কাঁধ ঝাঁকাল রবিন। দরজার দিকে তাকাল। হাঁ হয়ে খুলে যাচ্ছে পাল্লাটা। ভেতরে ঢুকলেন একজন বয়স্ক মানুষ, দাড়ির রং ধূসর হয়ে গেছে, মাথায় বসানো গাঢ় নীল রঙের ক্যাপ্টেনের হ্যাট। যাত্রীদের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'সাগর খুব উত্তাল। কেমন আছেন সবাই?'

'কখন পৌঁছাব আমরা?' গুঙিয়ে উঠল মুসা। নিজেকে জোর করে টেনে তুলে বসাল। 'মনে হচ্ছে যেন অনন্তকাল ধরে চলেছি এই বোটে করে।'

'তাই।' মাথা ঝাঁকালেন দাড়িওয়ালা ভদ্রলোক। 'সব সময়ই এ রকম দু-একজনকে পাওয়া যায়, যারা জাহাজে চড়তে অভ্যস্ত নয়।' জোরে হেসে উঠে তিনি মুসার পিঠে এক চাপড় মারলেন। মুখ বাঁকালো মুসা। দুই হাতে বেঞ্চের কিনার চেপে ধরে নিজেকে সামলাল। 'ভাগ্যিস গরমকালে এসেছিলে। শীতকালে সি স্টারে চড়লে এতক্ষণে আধমরা হয়ে যেতে।'

অন্য যাত্রীদের দিকে ঘুরলেন তিনি। 'আমি আপনাদের ক্যাপ্টেন। আমার নাম ক্রিমসন রোজার। তবে আমাকে ক্যানি বলে ডাকতে পারেন, সবাই তা-ই ডাকে।'

'ক্যানি', চার বাচ্চার মা বলল, 'একটা কথা জিজ্ঞেস না করে পারছি না—আপনি যে এখানে চলে এলেন, বোট চালাচ্ছে কে?'

আবার হেসে উঠলেন ক্যানি। কয়েকটা দাঁত খোয়া যাওয়া মাড়ি বেরিয়ে পড়ল। 'ও নিয়ে আপনি দুশ্চিন্তা করবেন না, ম্যাম। অটোমেটিক পাইলটে দিয়ে এসেছি। এখন আমরা খোলা সাগরে রয়েছি, তাই। আবার যখন সময় হবে ব্রিজে ফিরে গিয়ে জাহাজের হাল ধরব। ওখানে একটা ঘর আছে আমার। কেউ দেখতে আসতে চাইলে আমার সঙ্গে আসতে পারেন।'

'মমি, দেখো!' জানালার দিকে হাত তুলে চেঁচিয়ে উঠল একটা বাচ্চা। 'কুয়াশা চলে গেছে!'

কেবিনের জানালা দিয়ে বাইরে উঁকি দিয়ে হাসল কিশোর। মেঘ ভেদ করে বেরিয়ে এসেছে কয়েক ফালি রোদ, আকাশের একটা বড় অংশ দেখা যাচ্ছে।

'বোটের গলুই থেকে এখন ক্যানারি দেখা যাবে', ক্যানি বললেন। 'খুব সুন্দর দৃশ্য।'

সঙ্গে সঙ্গে দরজার দিকে দৌড় দিল চারটে ছেলেমেয়ে। পেছন থেকে ওদের বাবা সাবধান করল, 'রেলিংয়ের কাছে যেয়ো না!'

রবিনও উঠে দাঁড়াল। 'দেখে আসি। কিশোর, তুমি যাবে?'

'নাহ্', কিশোর বলল। 'আমি ব্রিজে যাব, সি স্টারকে কীভাবে চালানো হচ্ছে দেখতে।' ক্যাপ্টেনের দিকে ফিরে বলল, 'ক্যানি, যদি আপনার কোনো আপত্তি না থাকে।'

'আমার কোনো অসুবিধে নেই', ক্যানি জবাব দিলেন।

'থ্যাংকস।' ক্যাপ্টেনকে অনুসরণ করে, ছোট্ট সিঁড়ির ধাতব ধাপগুলো পেরিয়ে ব্রিজে উঠে এল কিশোর। ওর কাছে বড় একটা আলমারির মতো লাগল জায়গাটা, পুরু কাচ লাগানো জানালা দেওয়া। এখান থেকেও দেখা যাচ্ছে ক্যানারি আইল্যান্ড, সাগরের বুকে একটা কুঁজো তিমির পিঠের মতো উঁচু হয়ে আছে।

'আমি যতটা ভেবেছিলাম, দেখে মনে হচ্ছে মূল ভূখণ্ড থেকে তার চেয়েও দূরে ওই দ্বীপটা। যেন আরেক দুনিয়া ওটা।' কিশোর বলল। ক্যাপ্টেনের দিকে তাকাল ও। রোদে-বাতাসে পোড় খাওয়া হাত দিয়ে হাল ঘোরানোর মস্ত কাঠের চাকাটা চেপে ধরেছেন তিনি।

'তাই, অন্য দুনিয়া,' হেসে মাথা ঝাঁকালেন ক্যানি। 'জাহাজে করেই শুধু যে দুনিয়ায় যাওয়া যায়।'

'ওই দ্বীপের জনসংখ্যা কত?' জানতে চাইল কিশোর।

'এই দেড় শর মতো', ক্যানি জবাব দিলেন। 'তবে গরমের সময় প্রতিদিন প্রায় ২০০ করে বহিরাগতকে বয়ে আনি আমি।' ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেললেন তিনি। 'তবে এ বছর পারছি না।'

'কেন পারছেন না?' জিজ্ঞেস করল কিশোর। 'সমস্যাটা কী?'

কিশোরের দিকে তাকালেন তিনি। 'এমিলি জনসনের ভাইয়ের ছেলে তুমি?'

'না, আমি না, আমার বন্ধু মুসা', কিশোর জানাল। 'ওই যে, কেবিনে যে অসুস্থ হয়ে পড়ে আছে।'

'ও, জাহাজে চড়ায় অনভ্যস্ত ছেলেটা!' হেসে বললেন ক্যানি। 'তাই বলো।'

'জাহাজে চড়ায় মোটেও অনভ্যস্ত নয় ও', হেসে জবাব দিল কিশোর। 'বরং অনেক বেশি অভ্যস্ত। আসলে অতিরিক্ত খেয়ে ফেলেছে। খাবার দেখলে হুঁশ থাকে না। যা-ই হোক, আমি কিশোর পাশা। আমার সঙ্গে আরেকজন যে বসে ছিল, বাদামি চুলওয়ালা, ওর নাম রবিন, আমার বন্ধু। এ সপ্তাহটা এমিলি আন্টির বাড়িতে থেকে ছুটি কাটাব আমরা।'

'অনেক দিন এমিলিকে দেখি না', ক্যানি বললেন। 'বেশ কিছুদিন ধরে বাড়িটা শুধু ভাড়াই দিয়ে রাখছে। ইদানীং দ্বীপের বেশির ভাগ বাড়ির মালিকই অবশ্য তা-ই করছে। এটাই সমস্যা, ওই যে তুমি জিজ্ঞেস করলে।'

'বুঝলাম না', কিশোর বলল।

'বেশ, বুঝিয়েই বলছি। আমি যখন ছোট ছিলাম, ক্যানারি আইল্যান্ড ছিল একটা ফিশিং আইল্যান্ড—একটা অতি চমৎকার মাছ ধরার জায়গা', ক্যানি বললেন। 'যদি তুমি সহজ সাধারণ জীবন চাও, আজকাল মানুষ যেসব ছাড়া নিজেদের অচল ভাবে, এই যেমন বিদ্যুৎ, গাড়ি, টেলিফোন, এসব বাদ দিলে খুব শান্তি আর সস্তার একটা জীবন পাওয়া যেত তখন এখানে। খুব দ্রুত এই দ্বীপটার সৌন্দর্য আর শান্তির কথা ছড়িয়ে পড়ল বাইরের জগতে। ছুটে এল মানুষ। বাড়ি বানানো শুরু করল। ছবি আঁকিয়েরা এল দল বেঁধে। একটা আর্টিস্ট কলোনিই গড়ে উঠল এখানে। কেউ কেউ রীতিমতো বিখ্যাত হয়ে গেল। কলি জেসনের নাম শুনেছ?'

'নিশ্চয়ই', মাথা ঝাঁকালো কিশোর। 'কে না শুনেছে?'

'ক্যানারিতে ওর একটা বাড়ি আছে, শিপরেকের কাছে। বড়, সাদা আর ধূসর রং করা একটা বাড়ি। যা-ই হোক, প্রচুর লোক আসতে আরম্ভ করল দ্বীপটাতে। আর যতই দেখল, ততই পছন্দ করল, ততই ভালো লাগল ওদের। দেখতে দেখতে ট্যুরিস্টদের বন্যা বইতে শুরু করল জায়গাটায়। কেউ কেউ দিনে এসে দিনে চলে যেতে লাগল, তাদের মধ্যে মিস কলির ভক্ত আর বন্ধুরাও থাকত। কেউ বা বাড়ি ভাড়া নিয়ে পুরো ট্যুরিস্ট মৌসুমই থেকে যেত। তবে আমার মতে, অস্থায়ী বাসিন্দারা কখনোই স্থায়ী বাসিন্দাদের মতো মাথা ঘামায়নি দ্বীপটাকে নিয়ে। ঘামায়ও না। এটাই মানুষের স্বভাব। যারা দিনে এসে দিনে চলে যায়, তাদের আচরণ তো আরও খারাপ। ক্যান্ডির মোড়ক, কোকের বোতল আর অন্যান্য আবর্জনা সৈকতে এমনভাবে ছুড়ে ফেলে নোংরা করে, যেন ওটা ওয়েস্টবাস্কেট।'

'খুব খারাপ', কিশোর বলল। ও জানে, অবিবেচক মানুষ কীভাবে সুন্দর জায়গাগুলোকে নোংরা করে।

'ট্যুরিস্টরা আরও একটা সমস্যা সৃষ্টি করল, ভয়াবহ সমস্যা, আকাশে তুলে দিল জিনিসপত্রের দাম! শাঁই শাঁই করে এমনভাবে বাড়িয়ে দিল, আমার মতো কম আয়ের মানুষ এখানে বাস করার সামর্থ্য হারাল।' বিষণ্ন ভঙ্গিতে মাথা নাড়লেন ক্যানি। 'আর দাম বাড়লে যা হয়—এখন আমাদের এখানকার মানুষের মনেও অপরাধপ্রবণতা সৃষ্টি হয়েছে, অন্যান্য এলাকার মতো।'

'অপরাধ?' কান খাড়া হয়ে গেল কিশোরের। রহস্যের গন্ধ পেয়ে গেছে।

'হ্যাঁ। গত শীতকাল থেকে। প্রথমে দেয়াললিখন আর ময়লার ড্রাম কাত করে ফেলা দিয়ে শুরু। প্রথমে ভেবেছিলাম দ্বীপের দুষ্টু ছেলেদের কাজ। কিন্তু দ্বীপে অল্পবয়সী ছেলে এমনিতেই খুব কম। যারা আছে তারাও খুব ভালো, এক রুমের একটা স্কুলে সবাই মিলেমিশে পড়াশোনা করে। একটা ভীষণ দুষ্টু ছেলে অবশ্য ছিল, খুব জ্বালাত, তবে সেটা কয়েক বছর আগে। যা-ই হোক, শিগগিরই বুঝতে পারলাম আমরা, কাজটা দুষ্টু ছেলেদের নয়।' থেমে গিয়ে কিশোরের দিকে তাকালেন ক্যানি। 'তোমার কান ঢাকো।'

না বুঝেই দুই হাতে কান ঢাকল কিশোর। একটা বোতাম টিপলেন ক্যানি। বিকট শব্দে ফেটে পড়ল যেন একটা হর্ন, বোটটা যে আসছে এ ব্যাপারে সাবধান করে দিল দ্বীপবাসীদের।

দ্বীপটা এখন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে কিশোর। পাথুরে তীরের এক কিনারে একেবারে তীরঘেঁষে একটা পুরোনো মরচেপড়া জাহাজ ডুবে রয়েছে, অর্ধেকটা জেগে রয়েছে পানির ওপর। ওটার কাছাকাছি ডাঙায় দাঁড়িয়ে আছে একটা বড় বাড়ি, সাদা আর ধূসর রং করা। কিশোর বুঝল, আর্টিস্ট মিস কলি জেসনের বাড়ি, এটার কথাই বলেছিলেন ক্যানি। আর ওই ডুবে যাওয়া জাহাজটার জন্যই জায়গাটার নাম হয়েছে 'শিপরেক'। দ্বীপের কিনারে দুই প্রান্ত থেকে মাঝামাঝি জায়গায় রয়েছে জাহাজঘাটা, ফেরিটাকে আসতে দেখে লোক জড়ো হয়েছে। দেখে মনে হয়, জাহাজঘাটাকে কেন্দ্র করেই যেন পেছনে পাহাড়টাকে রেখে গড়ে উঠেছে বেশির ভাগ বাড়িঘর। শহরের মাথার ওপর রয়েছে ঘন সবুজ উঁচুভূমি, যেটা এখনো তার স্বাভাবিক প্রাকৃতিক পরিবেশ বজায় রাখতে পেরেছে। জায়গাটার সৌন্দর্য দেখে এখানে কোনো ধরনের অপরাধ যে ঘটতে পারে, কল্পনা করাও কঠিন হলো কিশোরের পক্ষে।

দ্বীপের ছবির মতো দৃশ্যের দিক থেকে ক্যাপ্টেনের দিকে চোখ ফেরাল কিশোর। 'আপনি বললেন, দুষ্টু ছেলের কাজ ছিল না ওগুলো। এর মানে কী?'

ভুরু কোঁচকালেন ক্যানি। 'ওগুলো এতটাই বেড়ে গেল, বোঝাই গেল ছেলেছোকরাদের দুষ্টুমি নয়। জানালার কাচ ভাঙা হলো, কমপক্ষে এক কুড়ি। তারচেয়েও খারাপ যেটা, তা হলো, চিংড়ির বয়াগুলো কেটে চিংড়ি ধরার ফাঁদ থেকে আলাদা করে দেওয়া। এখানকার স্থানীয় মানুষের আয়ের প্রধান উৎসই হলো চিংড়ি মাছ ধরা।'

'জানি', জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল কিশোর। রোদ-ঝলমলে সাগরের পানিতে অসংখ্য বয়া ঢেউয়ের তালে তালে ওঠানামা করতে দেখল।

'ওই যে বয়াগুলো দেখছ, এর প্রতিটি বয়া একটা করে পরিবারের ভরণপোষণের ব্যবস্থা করে', আঙুল তুলে দেখালেন ক্যানি। 'বয়া কেটে দিলে ফাঁদটা আর কোনোমতেই খুঁজে পাওয়া যায় না। আবার গিয়ে নতুন ফাঁদ কিনে এনে নতুন করে পাততে হয়।'

'খুব সিরিয়াস ব্যাপার', কিশোর বলল।

'অবস্থা এতটাই খারাপ হয়ে উঠল, মেইনল্যান্ডের পত্রিকাগুলোতেও ক্যানারির এই অপরাধপ্রবণতা নিয়ে প্রতিবেদন ছাপা হলো।' বিরক্ত ভঙ্গিতে মাথা নাড়লেন

ক্যানি। 'ট্যুরিস্টরা ভয় পেয়ে গেল। আসা বন্ধ করে দিতে লাগল তারা। দ্রুত কমে গেল ট্যুরিস্টের সংখ্যা। ওদের যে আমি খুব একটা ভালোবাসি, তা বলা যাবে না, তবে এখন ওরাই আমাদের রুটি-রুজির বিষয়। ওদের ওপর নির্ভর করায় অভ্যস্ত হয়ে গেছি। পরিস্থিতি যদি আবার স্বাভাবিক না হয়, তাহলে শেষ পর্যন্ত দ্বীপটার ভাগ্যে কী যে ঘটবে বলা কঠিন।'

ক্যানির উদ্বিগ্ন মুখের দিকে তাকাল একবার কিশোর, আবার মুখ ফেরাল দ্বীপের সৌন্দর্যের দিকে। ক্রমেই কাছে এসে যাচ্ছে ওটা। সে, রবিন আর মুসা মিলে সমস্যাটার সমাধান করতে পারবে কি না ভাবল। এক সপ্তাহ থাকবে এখানে। তদন্ত করার যথেষ্ট সময় পাবে।

'যাই, নিচে যাই', বলল ও। 'থ্যাংকস, ক্যানি। আপনার সঙ্গে কথা বলে খুব ভালো লাগল।'

'শুনে খুশি হলাম,' চওড়া হাসি ফুটল ক্যাপ্টেনের মুখে। 'কথা বলতে খুব ভালো লাগে আমার, বেশি কথা বলি, দ্বীপের অনেকেই তা-ই—মানে আমার পুরোনো বন্ধুরা আমার নামই দিয়ে ফেলেছে বাচাল। ইচ্ছে করলে তুমিও বাচাল ডাকতে পারো, হা হা হা!' হেসে মাথা ঝাঁকিয়ে সিঁড়ির দিকে রওনা হলো কিশোর। পেছন থেকে ডেকে বললেন ক্যানি, 'ফিরতিপথে আবার দেখা হবে তোমার সঙ্গে, যদি কোনো কারণে আগেই দেখা হয়ে না যায়।'

কেবিনে ঢুকে কিশোর দেখল, মুসা ছাড়া আর কেউ ওখানে নেই। বেঞ্চে চিত হয়ে পড়ে আছে। মুখটা আগের চেয়েও অসুস্থ দেখাচ্ছে। বন্দরের শান্ত পানিতে জাহাজ ঢোকায় কেবিনের সবাই ডেকে গিয়ে ভিড় করেছে।

'কী অবস্থা তোমার, মুসা?' কিশোর জিজ্ঞেস করল।

'ভালো', দুর্বল ভঙ্গিতে মৃদু হাসল মুসা। চোখের পাতা মেলল না।

'জাহাজঘাটায় প্রায় পৌঁছে গেছি', কিশোর বলল। 'তুমি কি দাঁড়াতে পারবে?'

'জানি না।'

'দেখো চেষ্টা করে। বাইরে বেরোলে তাজা বাতাসে হয়তো সুস্থ বোধ করবে।' মুসাকে উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করল কিশোর। ধরে ধরে বাইরে নিয়ে এল। রেলিংয়ের কাছে দাঁড়িয়ে দ্বীপের দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখল রবিনকে। ওর দিকে এগোল দুজনে।

ফিরে তাকাল রবিন। হেসে রসিকতা করল, 'বাহ্, এত সুস্থ তোমাকে কখনো দেখিনি, মুসা।'

'হা হা!' তিক্ত হাসি হেসে মুখ ভেংচাল মুসা। 'আমার কষ্ট দেখে মজা পাচ্ছ।' তাজা বাতাসে ভারী দম নিয়ে দুর্বল ভঙ্গিতে রেলিংয়ের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়াল সে।

বোটের গতি কমে গেছে। খুব ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছে জনাকীর্ণ ডকের দিকে। ওদের দেখে রবিনের মনে হলো দ্বীপের সবাই যেন জাহাজটার আগমন দেখতে চলে এসেছে। বলল, 'নিশ্চয় এত শান্ত জায়গায় এই ফেরি ভেড়াটা এক বিরাট ঘটনা।'

ক্যানির কাছে যা যা শুনেছে, দ্রুত মুসা ও রবিনকে জানাল কিশোর। শুনে বিড়বিড় করল রবিন, 'হুম্, যতটা শান্ত লাগছে ততটা শান্ত নয় তাহলে জায়গাটা।'

ডকে ভিড়লে বোট থেকে নেমে এল ছেলেরা। মানুষগুলো যেখানে জটলা করছে, হেঁটে এসে সেখানে দাঁড়াল, জাহাজ থেকে ওদের মালপত্র নামার অপেক্ষায়। হালকা মালপত্র নিয়ে এসেছে তিনজনেই, তবে মুসাকে একটা ছবি আঁকার বড় ইজেল আনতে হয়েছে ওর এমিলি আন্টির অনুরোধে। তাঁর ধারণা, এই ইজেলটার লোভে হয়তো কোনো আর্টিস্ট তাঁর বাড়িটা ভাড়া নিতে আগ্রহী হবে।

দাঁড়িয়ে থেকে দেখতে লাগল তিনজনে। বোট থেকে ভারী মাল নামিয়ে ট্রাকে ভরছে কয়েকজন লোক। খাবারের বাক্স, বাড়িঘরের জন্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র, মাছ ধরার সরঞ্জাম তো আছেই, আছে দোকানদার ও দ্বীপবাসীর জন্য জরুরি আরও নানা রকম জিনিস।

'আমি তো জানতাম এ দ্বীপে গাড়ি ব্যবহারের অনুমতি নেই', কাছেই দাঁড়িয়ে থাকা একটা ট্রাক দেখাল রবিন।

'কার ব্যবহারের অনুমতি নেই, ট্রাক নয়', শুধরে দিল মুসা। 'তোমার তো খুশি হওয়া উচিত, রবিন। এই ট্রাক না থাকলে আমাদের সমস্ত মালপত্র বয়ে নিয়ে পাহাড়ের ওপরের বাড়িতে উঠতে হতো।'

তেইশ-চব্বিশ বছরের একজন পেশিবহুল লোককে ওদের মালগুলো জাহাজ থেকে নামিয়ে ট্রাকে তুলতে দেখল তিনজনে। রোদে পোড়া বাদামি চুল লোকটার। পুরু গোঁফ। গায়ে সবুজ-কালো রঙের চেককাটা একটা শার্ট।

'এগুলো আমাদের ব্যাগ', লোকটাকে বলল কিশোর। 'জনসন হাউসে যাবে।' হাত বাড়িয়ে দিল ও। 'আমি কিশোর পাশা।'

কিশোরের হাতটার দিকে তাকাল লোকটা, তবে ধরল না। 'এক ব্যাগের জন্য এক ডলার ভাড়া লাগবে,' ভোঁতাস্বরে বলল ও। 'বেশি ভারী বোঝা হলে দুই ডলার।'

ভাড়া মিটিয়ে দিল কিশোর। তারপর হেঁটে এসে দাঁড়াল মুসা ও রবিনের কাছে। জানাল, 'স্থানীয়দের কাছে উষ্ণ অভ্যর্থনা পেলাম না।'

হঠাৎ ডকের উল্টোদিক থেকে হট্টগোল শোনা গেল। দুজন লোক একে অন্যকে ঘুসি মারার চেষ্টা করছে। ভিড় জমে যাচ্ছে। 'এ কাজ কেন করলে তুমি, হ্যারি? কেন আমার বয়া কাটলে?' চেঁচিয়ে বলল লাল শার্ট পরা, সোনালি চুলওয়ালা একজন লোক, তারের মতো পাকানো দেহ তার।

'আমি তোমার বয়া ছুঁয়েও দেখিনি, টম!' চেঁচিয়ে বলল লম্বা, টাকমাথা, ওভারঅল পরা অন্য লোকটা। 'আমাকে দোষ দিতে চাইছ তুমি নিজের দোষ আড়াল করার জন্য। আসলে আমার ফাঁদগুলো তুমিই চুরি করেছ।'

'কী, আমাকে চোর বললে, হ্যারি?' আরও জোরে চেঁচিয়ে উঠল টম। 'আমি চোর?' প্রচণ্ড রাগে মাটিতে পড়ে থাকা একটা শাবল তুলে নিয়ে মাথার ওপর উঁচু করে ধরল। 'চুরি করে উল্টো আমাকেই চোর বলা হচ্ছে। তোর মাথা আমি গুড়ো করে দেব এই শাবল দিয়ে। এই মুহূর্তে খুন করব।'

দুই

চোখের পলকে অ্যাকশনে চলে গেল কিশোর ও রবিন। শাবল ধরে রাখা লোকটার হাতে একটা ফ্লাইং কিক মারল কিশোর। ডকের ওপর দিয়ে গড়িয়ে গিয়ে পানিতে পড়ল লোকটার হাতের শাবল। রবিন হ্যারিকে চেপে ধরে আটকে ফেলল। কিশোর ধরল টমকে। 'ছাড়ো আমাকে, ছাড়ো!' চেঁচাতে লাগল টম। কিন্তু নিজের হাত ছুটাতে পারল না, পিছন দিকে মুচড়ে এনে পিঠের ওপর চেপে ধরেছে কিশোর।

'কী হচ্ছে এখানে?' রুপালি চুলওয়ালা একজন লোক ভিড় ঠেলে এগিয়ে এলেন ডকের কিনারে। গায়ে সদ্য ইস্তিরি করা একটা নীল শার্ট, পরনে ধূসর প্যান্ট। শার্টের পকেট থেকে উঁকি দিচ্ছে একটা নোটপ্যাড আর একটা কলমের মাথা। কাছে এসে গম্ভীর ভঙ্গিতে মাথা নেড়ে বললেন, 'আবার শুরু করেছ তোমরা?'

'মর্নিং, শেরিফ,' মিন মিন করে বলল হ্যারি। শান্ত হয়ে গেছে। তাই রবিন ওকে ছেড়ে দিল। টমও শান্ত হয়ে এসেছে, তাই ওকেও ছেড়ে দিল কিশোর।

টাকমাথা লোকটার দিকে অভিযোগের আঙুল তুলল টম। 'ও এই কাজ আবার করেছে, বাক। আমার বয়া কেটে দিয়েছে।'

'আর আমার ঝুপড়ি থেকে ফাঁদগুলো কে চুরি করেছে?' খেঁকিয়ে উঠল টম।

'মুখ সামলে কথা বলো,' আবার ফুঁসে উঠল হ্যারি।

'থামো তোমরা, শান্ত হও। মারামারি করা দরকার নেই।' পকেট থেকে এক প্যাকেট চুইংগাম বের করে দুজনকেই সাধলেন তিনি, ওরা কেউই নিল না। 'তোমাদের কারও কাছেই কারও বিরুদ্ধে কোনো প্রমাণ নেই। আর আমি বিশ্বাস করি, তোমরা দুজনে এ কাজ করোনি। তবে একটা কথা জোর দিয়ে বলতে পারি, এ সব যে করছে, তাকে ধরতে পারলে ছাড়ব না। আচ্ছামতো শায়েস্তা করব।'

'আপনি ঠিকই বলেছেন', শান্ত হয়ে এসেছে টম। 'হ্যাঁ, আমার কাছে সত্যিই কোনো প্রমাণ নেই। সরি, হ্যারি, মেজাজ ঠিক রাখতে পারিনি।'

'হুঁ', টাকমাথা লোকটা জবাব দিল, 'আমি তোমার বয়া কাটিনি।' শেরিফের দিকে ফিরল ও। 'তোমার কথা ঠিক, বাক।'

'বাক, যত তাড়াতাড়ি পারো পাজি লোকটাকে ধরে এই সমস্যার সমাধান করো।' বলল টম, 'এ রকম ঘটনা যদি আর মাত্র একবার ঘটে, আমি বাড়িঘর সব বেচে দিয়ে সোজা ফ্লোরিডায় চলে যাব।'

'আহ্, দেখতে বড় ইচ্ছে করছে আমার', ফোড়ন কাটল হ্যারি। 'ফ্লোরিডার প্রচণ্ড গরম সহ্য করতে না পেরে দুই হাত মাথার ওপর তুলে চেঁচাতে চেঁচাতে আবার মেইনিতে ফিরে আসছ, দারুণ মজার দৃশ্য হবে সেটা।'

'এই ঝামেলা তোমাকে বন্ধ করতেই হবে, বাক', অনুরোধের সুরে বলল টম। 'মাটিতে রাখা ওর কিছু জিনিসপত্র তুলে নিয়ে যাওয়ার জন্য ঘুরে দাঁড়াল।

'আমার সাধ্যমতো চেষ্টা তো আমি অবশ্যই করব।' বলে কিশোরদের দিকে ঘুরলেন শেরিফ। উত্তেজনা কেটে গেছে বুঝে আস্তে আস্তে সরে যেতে লাগল উৎসুক দর্শকেরা। 'তোমাদের ধন্যবাদ', কিশোরদের বললেন শেরিফ। 'অনেক সাহায্য করেছ তোমরা। আমার নাম বাক উইনার। এতক্ষণে নিশ্চয় জেনে গেছ, আমি এখানকার শেরিফ।'

নিজেদের পরিচয় দিল কিশোর ও রবিন। মুসাকে আগে থেকেই চেনেন শেরিফ, ছোটবেলা থেকেই এ দ্বীপে আসে ও। জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার এমিলি আন্টি কেমন আছে?' হাসলেন তিনি। এই প্রথম হাসি দেখা গেল তাঁর মুখে। 'বহুকাল দেখি না।'

'ভালো', দুর্বলকণ্ঠে জবাব দিয়ে, কপালের ঘাম মুছল মুসা।

'মিস্টার বাক', কিশোর বলল, 'শুনলাম, ইদানীং নাকি দ্বীপে নানা রকম অপরাধ ঘটছে। আমরা কি তোমাকে সাহায্য করতে পারি?'

দীর্ঘ একটা মুহূর্ত তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ওদের দিকে তাকিয়ে রইলেন শেরিফ। কী ভাবছেন তিনি, বুঝতে পারছে না কিশোর। তারপর বাক বললেন, 'না, তোমরা আবার নতুন কোনো ঝামেলা পাকাবে না। তবে তোমরা চাইলে আজ দুপুরে আমার সঙ্গে আমার বোটে করে মাছ ধরতে যেতে পারো।'

উত্তেজিত ভঙ্গিতে পরস্পরের দিকে তাকাল কিশোর ও রবিন। 'নিশ্চয় যাব!' রবিন বলল। 'কয়টার সময়?'

'ঠিক দুটোয় এখানে দেখা কোরো আমার সঙ্গে', বাক বললেন।

'আমি যেতে পারব না', মুসা বলল। 'আমি বাড়িতেই শুয়ে থাকব। শরীর এখনো খুব কাহিল।'

'সত্যিই যেতে পারবে না?' কিশোর জিজ্ঞেস করল।

'সত্যিই পারব না', মুসা বলল। 'আজকে আবার বোটে চড়ে সাগরে গেলে ঠিক মারা যাব।'

এরপর এমিলির বাড়ির দিকে রওনা হলো তিনজনে। মুসা বলল, বাড়িটা আধমাইল দূরে। শহরের প্রধান অংশের পাশ দিয়ে চলল ওরা। একটা কফি শপ, একটা আর্ট গ্যালারি, কয়েকটা মাছের দোকান আর একটা জেনারেল স্টোর—সবই কাঠের তৈরি। ক্যানারির কোনো কিছুই আধুনিক নয়। পুরোনো একটা বড় হোটেল পেরিয়ে এল ওরা, সাইনবোর্ডে নাম লেখা : ক্যানারি ইন।

'বেশির ভাগ বাড়িঘরই শহরের কাছাকাছি', মুসা বলল। 'দ্বীপের বাকি অংশে মানুষের হাত লাগেনি। একদম স্বাভাবিক অবস্থায় রয়েছে। বুনো পথ, বন, পাহাড়ের চূড়া—সব।'

'আজ রাতে ওখানে ক্যাম্প করলে কেমন হয়?' প্রস্তাব দিল রবিন।

'না', মাথা নাড়ল মুসা, 'এ দ্বীপের কোথাও ক্যাম্পিংয়ের অনুমতি নেই। আগুনকে ভয় পায় দ্বীপের

স্থানীয় বাসিন্দারা, আগুন লেগে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য নষ্ট হয়ে যাবার ভয়ে কোনো রকম ঝুঁকি নিতে চায় না।'

'তাহলে ঘুরতে যেতে পারি, বনের ভেতর ঘুরে বেড়াতে তো কোনো অসুবিধে নেই', কাঁচা মাটির রাস্তা ধরে হাঁটতে হাঁটতে বলল রবিন। শহর ছাড়িয়ে এসে পাহাড় বেয়ে উঠছে এখন ওরা।

সাগরের তাজা বাতাস বুক ভরে টেনে নিল কিশোর। 'জায়গাটা কিন্তু দারুণ!'

'যদিও আসার পথে অনেকগুলো 'ফর সেল' লেখা সাইনবোর্ড দেখলাম', রবিন বলল। 'বাড়ি বিক্রি করে দিয়ে এত সুন্দর জায়গা ছেড়ে চলে যেতে চাইছে লোকগুলো।' বলতে বলতে নীল রং করা একটা সুন্দর ছোট কাঠের বাড়ি পাশ কাটাল ওরা। সামনের আঙিনায় রিয়াল এস্টেটের নোটিশ দেখা যাচ্ছে।

'এমিলি আন্টি বলেছে, ভাড়ার ব্যবসাটা যদি আর না ওঠে, সে-ও বাড়ি বিক্রি করে দেওয়ার চেষ্টা করবে', মুসা বলল। 'তবে বিক্রি যদি না করত, ভালো হতো। এ দ্বীপটা আমার ভীষণ পছন্দ।'

শিগগিরই একটা চৌরাস্তায় এসে পড়ল ওরা। বাঁয়ের রাস্তাটার পাশে সাইনবোর্ডে লেখা রয়েছে 'হক'স হিল রোড'। রাস্তাটা যে পাহাড়ের ওপর উঠে গেছে, সেটা আরও খাড়াই। 'এই পথের শেষ মাথায় রয়েছে আমার আন্টির বাড়ি', মুসা জানাল।

হক'স হিল রোডের পাশের বাড়িগুলো নিচে যেগুলো দেখে এসেছে ওরা, তারচেয়ে অনেক বেশি সুন্দর আর বিলাসবহুল। ঝলমলে রং করা। বেগুনি রং আর হালকা হলুদ অলংকরণ করা বাড়ির সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় ওটার সাইনবোর্ড পড়ল রবিন, 'মেরি হ্যাভারস্ট্র, জলরং আর কাঠখোদাইয়ের কাজে পারদর্শী। দেখা করতে হলে অ্যাপয়েন্টমেন্ট লাগবে।'

'শিল্পী কার্ল কোলাওয়ের আঁকা তেলরং ছবির গ্যালারি', আরেকটা সাইনবোর্ড পড়ল মুসা, রাস্তার ধারের একটা সবুজ রং করা বাড়ির সামনে দিয়ে যাওয়ার সময়। 'সাধারণ দর্শকের দেখার জন্য দুপুর দুইটা থেকে পাঁচটা পর্যন্ত খোলা থাকে। সোমবার বন্ধ।'

'ক্যানারির আর্ট কলোনি বলে কী বোঝাতে চায় এখানকার লোকে, এতক্ষণে বুঝলাম', মৃদু হেসে রবিন বলল।

পাহাড়ের মাথায় এমিলির বাড়িতে পৌঁছাতে পৌঁছাতে দম ফুরিয়ে গেল মুসার। ফুরাবেই, কারণ ও অসুস্থ। এদিকে সুস্থ থেকেও কিশোর আর রবিনও হাঁপাচ্ছে।

'খাড়াইটা খুব বেশি!' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল রবিন।

'হ্যাল্লো! মুসা না?' ডেকে বললেন মোটামুটি খাটো, হালকা-পাতলা, ৬০ বছরের একজন মহিলা। এমিলির পাশের বাড়ির আঙিনায় দড়িতে কাপড় শুকোতে দিচ্ছেন তিনি।

'মিসেস রেনিন, কেমন আছেন?' জবাব দিল মুসা। বেড়ার কাছে এগিয়ে গেল।

'অনেক দিন তোমাকে দেখি না, মুসা', মিসেস রেনিন বললেন, 'দু-তিন বছর তো হবেই। শরীর-স্বাস্থ্য তো বেড়েছে, কিন্তু এমন দেখাচ্ছে কেন তোমাকে?'

প্রশ্নটা এড়িয়ে গিয়ে কিশোর আর রবিনের পরিচয় করিয়ে দিল মুসা। তারপর লনের সাইনবোর্ডটা দেখিয়ে বলল, 'আপনিই বাড়ি বিক্রির নোটিশ ঝুলিয়েছেন। আমি তো জানতাম, বাড়িটাকে ভীষণ ভালোবাসেন আপনি।'

'আসলে, মুসা', জবাব দিলেন প্রতিবেশী মহিলা, 'ক্যানারি আর আগের মতো নেই।'

'এই একই কথা তো অনেকেই বলছে', মুসা বলল।

'নোটিশ ঝুলিয়েছি, কিন্তু ক্রেতার সাড়া পাচ্ছি না, কেউ কোনো আগ্রহ দেখাচ্ছে না', বিষণ্ন হাসি হাসলেন মিসেস রেনিন। 'এসব চেষ্টাটেষ্টা বাদ দিয়ে যেভাবে আছি সেভাবেই থেকে যেতে বলছে আমার সাহেব।'

'অপেক্ষা করে দেখুন, ভালো দিন আবার আসতেও পারে', মুসা বলল।

দুই বন্ধুকে নিয়ে আন্টির বাড়ির সামনের সিঁড়ির কাছে পৌঁছাল ও। আর ঠিক এ সময় ওদের মালপত্র নিয়ে হাজির হলো সেই যুবক লোকটা, বন্দরে যার সঙ্গে দেখা হয়েছিল। পেশিবহুল বিশালদেহী লোকটার হাত থেকে নিজের ব্যাগটা নিয়ে রবিন বলল, 'হাই, আমি রবিন। আপনার নাম?'

'বুস্টার', নিচুস্বরে গোমড়ামুখে জবাব দিল লোকটা। হাতের অন্য বোঝাগুলো ঝপ করে ফেলে দিল ঘেরা দেওয়া বারান্দায়। 'ব্যাগের জন্য এক ডলার, ভারী বোঝার জন্য দুই', ইজেলটা দেখাল ও।

'কিন্তু জাহাজঘাটায়ই তো আপনার পারিশ্রমিক দিয়ে দিয়েছি আমি', কিশোর বলল।

'সেটা বাড়ি পৌঁছে দেওয়ার জন্য দিয়েছ, পাহাড়ের মাথায় বয়ে তোলার জন্য আলাদা ভাড়া', ভোঁতাস্বরে বলল বুস্টার। হাতের তালু চিত করে সামনে বাড়িয়ে দিল।

হাঁ করে তাকিয়ে রইল কিশোর। নির্বিকার ভঙ্গিতে ওর চোখের দিকে তাকিয়ে আছে লোকটা। দ্বিগুণ ভাড়া চাওয়ার জন্য কোনো রকম বিব্রত ভাব নেই। চোখ ঘুরিয়ে পকেটে হাত দিল কিশোর। দিয়ে দিল বাড়তি টাকা। টাকাগুলো পকেটে ভরে পুরোনো লক্কর ট্রাকটা চালিয়ে চলে গেল লোকটা।

'টাকা দিলে কেন ওকে?' রাগের সঙ্গে বলল রবিন।

'জানি না', অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে বলল কিশোর। 'এসেই এত তাড়াতাড়ি একজন শত্রু তৈরি করতে চাইনি। দ্বীপটা খুবই ছোট। যেকোনো সময় আবার ওর সঙ্গে দেখা হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে।'

'যাকগে, জিনিসপত্র বের করা দরকার', রবিন বলল। ব্যাগ হাতে নিয়ে ভেতরে চলল ও। 'লাঞ্চের সময় প্রায় হয়ে গেছে।'

'এহ্‌হে', মুখ বাঁকালো মুসা, 'খাবারের কথা মনে করাও কেন আবার?'

'সত্যি, মুসা, খাবারের কথা শুনলে তোমার খারাপ লাগে?' কৃত্রিম বিস্ময় রবিনের চোখে। 'অতি সুস্বাদু একটা সসেজ স্যান্ডউইচ পেলেও খাবে না?'

আরেক দিকে মুখ ফেরাল মুসা।

এমিলির বাড়ির ভেতরটা পুরোনো ধাঁচে তৈরি। সাদা দেয়াল, গোলাপি জানালা। ছোট একটা বসার ঘর, মস্ত রান্নাঘর আর ওপরতলায় দুটো বেডরুম আছে। বাড়ির সামনে থেকে সাগরের অপূর্ব সুন্দর দৃশ্য

দেখা যায়, যাকে বলে একেবারে দম বন্ধ করা দৃশ্য। পেছন থেকে দেখা যায় সবুজ ঘাসে ঢাকা জমি, যেখানে ফুটে রয়েছে রাশি রাশি হলুদ বুনোফুল।

কিশোরদের দোতলায় নিয়ে এল মুসা। দুটো বেডরুম। কে কোন ঘরে থাকবে, সেটার সমাধান করে দিল রবিন। মুসা যেহেতু অসুস্থ, ওকে আলাদা একটা ঘরে একা থাকতে বলল। তাতে আরাম হবে ওর। এমিলি আন্টির বেডরুমটা পড়ল মুসার ভাগে। কিশোর আর রবিন চলে এল বাড়তি গেস্ট বেডরুমটায়। এটার বিছানাটা বড়, দুজন খুব আরাম করেই শুতে পারবে।

'খুবই সুন্দর বাড়ি', ব্যাগটা ঘরের মেঝেতে নামিয়ে রাখল রবিন।

'থাকাও যাবে খুব আরামে,' ওর কথায় একমত হলো কিশোর। চারপাশে তাকাল। বাড়িটার মতোই আসবাবগুলোও খুব মজবুত আর পুরোনো ঢঙে বানানো। মস্ত বিছানাটায় পুরু গদি পাতা, অনেকগুলো বালিশ ফেলে রাখা হয়েছে তাতে। এক কিনারে ভাঁজ করে রাখা কয়েকটা কম্বল। জানালার কাছে রাখা গদিমোড়া চেয়ার আর ছোট কফি টেবিল।

দ্রুত ব্যাগের জিনিসপত্র খুলে সাজিয়ে রেখে মুসার ঘরে চলে এল দুজনে। রবিন জিজ্ঞেস করল, 'কি, লাঞ্চে যাবে না?'

'উঁহুঁহুঁ, আবার সেই একই কথা', নিজেকে বিছানায় ছুড়ে ফেলল মুসা। চিত হয়ে বলল, 'বহুবার বলেছি, আমি আজ কোথাও বেরোব না। শুধু আজ কেন, শরীরটা যে রকম খারাপ লাগছে, তাতে পুরো সপ্তাহটাই বেরোতে পারব কি না সন্দেহ আছে।'

'চলো, তাহলে আমরাই যাই', রবিনের দিকে তাকিয়ে বলল কিশোর। 'তুমি রেস্ট নাও, মুসা। আমরা যত তাড়াতাড়ি পারি ফিরে আসব।'

নিচতলায় নেমে এল কিশোর ও রবিন। বাইরে বেরিয়ে এল। পাহাড়ি পথ দিয়ে নিচে নেমে শহরের দিকে এগোল। জেনারেল স্টোর থেকে দ্বীপের একটা ম্যাপ কিনল। তারপর লাঞ্চ খেতে কফি শপে ঢুকল।

স্যান্ডউইচ চিবোতে চিবোতে ম্যাপটার ভাঁজ খুলল রবিন। দ্বীপের কোনো একজন আর্টিস্টের হাতে আঁকা ম্যাপের একটা ফটোকপি এটা। 'দ্বীপে মানুষের তৈরি সবকিছুরই চিহ্ন দেওয়া রয়েছে এতে', রবিন বলল। খুদে একটা বর্গক্ষেত্রের ওপর আঙুল রাখল ও। 'এই যে, এটা এমিলি আন্টির বাড়ি।' আরেকটা চিহ্ন দেখিয়ে বলল, 'এটা হক'স হিল রোড।'

'দেখি', ম্যাপটা কাছে টেনে নিল কিশোর। 'এই যে, এখানে রয়েছি আমরা এখন, কফি শপ। ডকটা এখানে, আর এটা শিপরেক, জাহাজ থেকে যেটা দেখেছি। নোটও লিখে দিয়েছে, এখানে রয়েছে একটা মালবাহী জাহাজের ধ্বংসাবশেষ, ১৮৫২ সালে ডুবে গিয়েছিল। আর এটা একটা আইস হাউস, ১৮১৭ সালে তৈরি হয়েছিল।'

ম্যাপের একটা বিশেষ জায়গার দিকে তাকাল রবিন। 'দেখো, জায়গাটা একেবারেই খালি।'

মাথা নাড়ল কিশোর, 'না, খালি নয়। আসলে এখানে কিছু বানানো হয়নি। তারকাচিহ্ন দিয়ে ওখানে কী লিখেছে, পড়ো তো।'

'ক্যানারি আইল্যান্ডের এই জায়গাটার মালিক একদল দ্বীপবাসী, যারা এর প্রাকৃতিক পরিবেশ বজায় রাখার জন্য অঙ্গীকারবদ্ধ হয়েছে', পড়ল রবিন। 'দারুণ তো!'

হাতঘড়ি দেখল, বলল রবিন, 'দুইটা প্রায় বাজে। চল বেরোই।' ম্যাপটা ভাঁজ করে রাখল।

বাইরে এসে ডকের দিকে এগোল দুজনে। দ্বীপটার প্রাকৃতিক পরিবেশটা এখনও পুরোপুরি নষ্ট হয়নি। কাঁচা মেইন রোডটা, অন্য যেসব রাস্তা দেখেছে ওরা, তারচেয়ে চওড়া। গাড়ির অনুমতি নেই, তাই রাস্তায় কোনো যানবাহন নেই, শুধু কয়েকজন লোক এদিক-ওদিক ঘুরছে, চমৎকার দিনটাকে উপভোগ করছে। জাহাজে দেখা সেই এশিয়ান দম্পতিকে দেখতে পেল কিশোর, হাত ধরাধরি করে দাঁড়িয়ে আছে জেনারেল স্টোরের সামনে। ওদেরও চিনতে পারল ওরা, পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় 'হাই' বলল লোকটা।

ঠিক এই সময় জাহাজে দেখা আরেক বৃদ্ধ দম্পতি, যারা কমলা খাচ্ছিল, তারা বেরিয়ে এল জেনারেল স্টোর থেকে। লোকটার হাতে দ্বীপের একটা ম্যাপ।

'হ্যাল্লো', ওদের দেখে হাসিমুখে হাত নাড়ল মহিলা।

আর্ট গ্যালারির সামনে এল ওরা। ঘোড়ার গাড়ির আকৃতিতে তৈরি বাড়িটার সদর দরজার সামনের সিঁড়ি ঝাড়ু দিচ্ছে একজন লাল চুলওয়ালা মহিলা। ওদের দেখে মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, 'গুড আফটারনুন।' কথায় খুব হালকা ইয়োরোপিয়ান টান, কোন দেশি, ঠিক ধরতে পারল না কিশোর।

'সবাই এখানে খুব আন্তরিক', রবিন বলল।

'এ রকম একটা জায়গায় এটাই স্বাভাবিক', কিশোর বলল। বিজনেস স্যুট পরা দুজন লোককে একটা দোকান থেকে বেরোতে দেখল, মাছ ধরার সরঞ্জাম বিক্রি করে দোকানটা, এই লোক দুজনকেও জাহাজে দেখেছিল ও। হাত তুলে বলল, 'হাই।'

একটা মুহূর্তের জন্য চমকে গেল বলে মনে হলো লোক দুজন। পরক্ষণে সামলে নিয়ে ওর মতোই 'হাই' বলে জবাব দিল। ওরা চলে গেলে হাসিমুখে রবিন বলল, 'এই দুজন মনে হচ্ছে আন্তরিক লোকদের দলে পড়ে না।'

জাহাজঘাটায় যাওয়ার পথের একটা মোড় পেরিয়ে প্রায় ১০ জন নারী-পুরুষের একটা দলের মুখোমুখি হলো দুই গোয়েন্দা। তাদের বেশির ভাগের হাতেই একটা করে খোলা বই। একনজর দেখেই কিশোর বুঝল, বইগুলো গাছপালার ওপর লেখা।

'এই, সাবধান, দেখে হাঁটো!' রবিনের দিকে তাকিয়ে চেঁচিয়ে উঠল কালো চুলওয়ালা লম্বা একজন মহিলা। 'তোমার পায়ের নিচের ওগুলো খুব দুষ্প্রাপ্য উদ্ভিদ।'

নিচের দিকে তাকাল রবিন। কাঁচা রাস্তাটায় পাথর ছাড়া আর কিছুই নেই, শুধু একগুচ্ছ আগাছা ছাড়া।

'এই যে, দেখো', রবিন চিনতে পারেনি বুঝে উবু হয়ে আঙুল দিয়ে ছোট্ট একটা সবুজ গাছ দেখাল মহিলা। 'এটা কাষ্ঠকদলীর চারা। শেক্সপিয়ারের সময় থেকেই এটাকে খুব মূল্যবান গাছ হিসেবে ভেবে এসেছে মানুষ। দয়া করে মাড়িয়ে দিয়ো না।'

'পলি, দেখো, পিগউইড!' রাস্তার ওপাশ থেকে বলে

উঠল আরেকজন বৃক্ষপ্রেমী। রবিনকে আরেকটা রুক্ষ চাহনি দিয়ে দ্রুত অন্য পাশে চলে গেল লম্বা মহিলা, সাবধান রইল, যাতে কোনো উদ্ভিদকে মাড়িয়ে না দেয়।

কিশোরের দিকে তাকাল রবিন, চোখে বিস্ময়। 'কী হচ্ছে এসব?'

'আমি কী করে বলব', কাঁধ ঝাঁকাল কিশোর।

কয়েক মিনিট পর জাহাজঘাটায় পৌঁছাল ওরা। শেরিফ বাক উইনারকে দেখল, ডকের একপাশের পাম্প থেকে তাঁর লালের ওপর সাদা অলংকরণ করা ফিশিং বোটের ট্যাংকে পেট্রল ভরছেন। মাছধরা এই বোটটার নাম রেখেছেন 'রেড লবস্টার'। ছোট বোটের পেছন দিকটায় জট পাকিয়ে রয়েছে যেন জালের স্তূপ। দুই গোয়েন্দাকে দেখে চিৎকার করে জিজ্ঞেস করলেন, 'মাছ ধরতে যেতে চাও, কডফিশ?'

'নিশ্চয়ই', খুশি হয়ে জবাব দিল কিশোর।

'তাহলে বোটে ওঠো', বাক বললেন। হাত বাড়িয়ে দিয়ে প্রথমে কিশোরের হাতটা ধরে ওকে বোটে উঠতে সাহায্য করলেন। তারপর রবিনকে। ডেকে পড়ে থাকা কতগুলো বড়শির পাশে মিষ্টি পানিতে অর্ধেক ভর্তি দুটো বাক্স দেখতে পেল কিশোর।

'চলো, রওনা হওয়া যাক।' বলে ইঞ্জিন স্টার্ট দিয়ে, দক্ষ হাতে বন্দরের প্রণালি পার করে বোটটাকে খোলা সাগরে নিয়ে এলেন। এতই গর্জন করছে ইঞ্জিন, এত শব্দের মধ্যে কথা বলা গেল না। দ্বীপের এক প্রান্তের একটা পাথুরে খাঁড়ির মাইল খানেক দূরে এনে ইঞ্জিন বন্ধ করে নোঙর ফেললেন।

'হপ্তা ধরে এখানে মাছগুলো টোপ গিলছে বেশ', বললেন তিনি। 'একটা বড়শি তুলে নাও। কীভাবে কাজটা করতে হবে দেখিয়ে দিচ্ছি।'

বিশ মিনিটের মধ্যেই বেশ কয়েকটা কড মাছ ডেকে রাখা মাছের বাক্সে লেজ দিয়ে বাড়ি মারতে লাগল।

'বাক', কথা বলার সুযোগ পেয়ে কিশোর বলল, 'জাহাজঘাটায় আসার সময় একদল লোককে দেখলাম, তাদের হাতে বই, গাছপালা নিয়ে আলোচনা করছিল।'

'ও, হ্যাঁ, তোমরা নিশ্চয় পলি বার্জেনের অ্যাকর্ন সোসাইটিকে দেখেছ', শেরিফ বললেন। 'প্রতি গ্রীষ্মেই আসে ওরা, ক্যানারি ইনে থাকে।'

'অ্যাকর্ন সোসাইটিটা আবার কী?' রবিন জানতে চাইল।

'ওটা ওদেরকেই জিজ্ঞেস করো। আমি বলতে গেলে হয়তো ভুল ব্যাখ্যা করে বসব', হেসে বললেন শেরিফ। 'ওদের ধারণা, পৃথিবীর সবাই শুধু গ্রহটার ক্ষতি করার তালে আছে। আমি পলিকে একদিন বলেছিলাম: ছোট্ট অ্যাকর্নের বীজ থেকেই বড় বড় নাটের জন্ম। আমার ছোট্ট রসিকতাটা হয় বুঝতে পারেনি, নয়তো পাত্তা দেয়নি ও।'

'কথাটায় রসিকতাটা কোথায়, বুঝলাম না', রবিন বলল।

কিন্তু কিশোর হাসছে। ও বুঝতে পেরেছে। বলল, 'বুঝলে না? অ্যাকর্ন মানে ওকের বীজ, সেটা তো জানো। আর নাট মানে বাদাম। আবার পাগলকেও নাট বলে। তিনি বলেছেন ছোট্ট অ্যাকর্ন বড় বড় পাগলের জন্ম দেবে। আসলে তিনি বোঝাতে চেয়েছেন, অ্যাকর্ন সোসাইটি হলো পাগলের দল।'

বুঝতে পেরে হাসল রবিন। হা হা করে হাসলেন শেরিফ। কিশোরকে বললেন, 'তুমি খুব বুদ্ধিমান ছেলে।'

রবিন বলল, 'আগাছায় পা দেওয়ার জন্য আরেকটু হলে আমাকে চিবিয়ে খেত পলি।'

'পলি ও রকমই', মাথা নাড়তে নাড়তে শেরিফ বললেন। 'আমি ওর কাণ্ডকারখানায় নজরই দিতাম না, যদি না নিজে যেটা বিশ্বাস করে সেটা পালন করানোর জন্য সারাক্ষণ মানুষকে বিরক্ত করত। এই যেমন ধরো, ওরা মাছ খায় না। না খাক, সেটা ওদের ব্যাপার। কিন্তু আমাদের এই দ্বীপটা একটা ফিশিং আইল্যান্ড। মাছই হলো এখানকার মানুষের জীবনধারণ ও জীবিকার উৎস। মাঝে মাঝে ওর কথা শুনলে মনে হয়, ক্যানারি থেকে সব জেলেকে তাড়িয়ে দিয়ে দ্বীপটাকে শুধু নিজের করে নিতে চায়।'

'তাই?' চিন্তিত ভঙ্গিতে বলল কিশোর। 'দ্বীপের এতসব অপরাধের সঙ্গে কে জড়িত বলে অনুমান আপনার?'

এক প্যাকেট চুইংগাম বের করলেন শেরিফ। রবিন আর কিশোরকে একবার সেধে তারপর একটা গামের মোড়ক ছাড়িয়ে মুখের ভেতর ছুড়ে দিলেন। 'বলা খুব কঠিন। এখানকার কাউকে দেখেই আমার মনে হয় না দ্বীপ কিংবা এর অধিবাসীদের ক্ষতি করতে পারে।'

'এইমাত্র আপনি বললেন পলি বার্জেন সব জেলেকে দ্বীপ থেকে তাড়াতে চায়', কিশোর বলল।

'হুঁ, তা বলেছি। কিন্তু সেটা এই অর্থে বলিনি।'

সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে আড়মোড়া ভাঙার ভঙ্গিতে হাত টানটান করলেন তিনি। 'সোডা খাবে? নিচে আছে।'

'হ্যাঁ, তা খাওয়া যায়', রবিন বলল। 'নোনা বাতাসে গলা শুকিয়ে গেছে।'

'তুমি?' কিশোরের দিকে তাকালেন বাক।

মাথা ঝাঁকাল কিশোর। 'থ্যাংকস।'

'পপকর্নও আছে। খেতে চাইলে নিজে গিয়ে আনতে হবে', বাক বললেন। তাঁকে অনুসরণ করে কেবিনে ঢুকল কিশোর। মেঝের একটা হ্যাচ খুললেন শেরিফ। ইঞ্জিনরুম আর স্টোররুমে যাওয়ার পথ।

ঢাকনা খুলেই চেঁচিয়ে উঠলেন শেরিফ, 'সর্বনাশ...পানি ঢুকছে!'

কিশোরও নিচে উঁকি দিল। যা দেখল, তাতে হাড়ের ভেতরও যেন কাঁপুনি উঠে গেল তার। ইঞ্জিনরুমের মেঝেতে চার ইঞ্চি পানি জমে গেছে। বোটের তলায় ইঞ্জিনের ঠিক পাশে একটা তিন ইঞ্চি গর্ত দিয়ে সমানে পানি ঢুকছে।

দুই টানে গায়ের শার্টটা প্রায় ছিঁড়ে খুলে ফেলে গর্তটায় চেপে ঢুকিয়ে দিলেন শেরিফ। 'এতে খুব একটা বন্ধ হবে না', উদ্বিগ্নকণ্ঠে বললেন তিনি। 'এ হারে পানি উঠতে থাকলে আর ইঞ্জিন ভিজে গেলে, বোটটা তলিয়ে যেতে বেশি সময় লাগবে না।'

তিন

'পানি সেচব কী দিয়ে?' চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'ওই যে', কিশোরের পেছনের দেয়ালে হুকে ঝোলানো দুটো বালতি দেখালেন শেরিফ। টান দিয়ে দুটো বালতিই নামিয়ে এনে একটা শেরিফের হাতে দিতে গেল কিশোর। ঠেলে ওটা সরিয়ে দিয়ে শেরিফ বললেন, 'ইঞ্জিনটাকে চালু রাখা দরকার।' বলেই দৌড়ে কিশোরকে পাশ কাটিয়ে চলে গেলেন কন্ট্রোল প্যানেলের কাছে।

বালতিতে পানি ভরে সিঁড়ির কাছে এসে চেঁচিয়ে ডাকল কিশোর, 'রবিন! জলদি এসো!'

'কী হয়েছে?' সিঁড়ি বেয়ে নেমে এসে জিজ্ঞেস করল রবিন। কিশোরের জবাব দেওয়ার প্রয়োজন হলো না। রবিনের মুখের ভঙ্গিই বলে দিল যা বোঝার বুঝে ফেলেছে ও। কিশোরের হাতের পানিভরা বালতিটা টান দিয়ে নিয়ে দৌড় দিল, বোটের কিনার দিয়ে কাত করে বালতির পানি ফেলে দিল সাগরে। তারপর আরেক বালতি নেওয়ার জন্য দৌড়ে ফিরে এল। কাজটা খুব গোলমেলে আর সময়সাপেক্ষ, ওদিকে পানি উঠে আসছে এত দ্রুত, সেচে কুলাতে পারছে না।

'ইঞ্জিন ভিজে গেলে আর কিছু করতে পারব না!' চেঁচিয়ে বললেন বাক। তবে ভাগ্য ভালো, চালু হয়ে গেল ইঞ্জিন। বোটের মুখ ঘুরিয়ে বন্দরের দিকে রওনা হলেন তিনি। যতটা তাড়াতাড়ি সম্ভব পানি সেচছে কিশোর আর রবিন, কিন্তু উঠে আসা পানির সঙ্গে পেরে উঠছে না।

'লাইফ জ্যাকেট পরে নাও, এই যে, এখানে আছে', বলে একটা কেবিনেট খুললেন শেরিফ।

কিন্তু কেবিনেটটা খালি। 'গতকালকেও তো ছিল', রাগতস্বরে বললেন তিনি। 'আমার বোটটাকে নিয়ে শয়তানি করছে কেউ।'

হঠাৎ গোলমাল শুরু করল ইঞ্জিন। তবে ততক্ষণে দ্বীপের পাশ ঘুরে এসে, শিপরেক ছাড়িয়ে, বন্দরের নিরাপদ এলাকায় পৌঁছে গেছে বোট। জাহাজঘাটার দিকে এগোনোর সময় বন্ধ হয়ে গেল ইঞ্জিন। বোটের তলা পানিতে অনেকখানি তলিয়ে গিয়ে, ভেসে ভেসে ডকের দিকে এগোল বোট।

ডকে পৌঁছার সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে নেমে পড়লেন শেরিফ। বোটের দড়ি শক্ত করে বেঁধে দিলেন খুঁটির সঙ্গে। 'এক্ষুনি ফুটোটা মেরামত করা দরকার', গম্ভীর স্বরে বলে দুই গোয়েন্দার দিকে তাকালেন। রাস্তার কিনারের একটা চালাঘর দেখিয়ে বললেন, 'ওই ঘরে আমার পাম্পটা পাবে, দরজার পাশেই, নিয়ে এসো।'

দৌড়ে গিয়ে পাম্পটা নিয়ে এল ওরা। ওটা দিয়ে বোট থেকে দ্রুত পানি সেচতে লাগলেন শেরিফ।

ফুটোর ভেতর আঙুল ঢুকিয়ে কিনারটায় হাত বুলিয়ে দেখলেন তিনি। বললেন, 'করাত দিয়ে কেটে ফুটোটা করেছে কেউ। বেশির ভাগটা কেটে রেখে দিয়েছিল। পানির চাপে বাকিটা ভেঙে খুলে এসেছে।'

'বাক, জানি অনেক অদ্ভুত কাণ্ডকারখানা ঘটছে দ্বীপে', কিশোর বলল, 'কিন্তু আপনার বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত আক্রোশ আছে নাকি কারও?'

জোরে শ্বাস টানলেন শেরিফ। 'বেশ', চোয়াল শক্ত হয়ে গেছে তাঁর, 'তোমরা আমাকে সাহায্য করবে বলেছিলে না? দ্বীপে কে এসব অঘটন ঘটাচ্ছে, তোমরা যদি খুঁজে বের করতে পারো, তো করো, আমার কোনো আপত্তি নেই। আমি শেরিফ, স্বাভাবিকভাবেই আমার কিছু শত্রু তৈরি হতে পারে। পলি বার্জেন, কিংবা তার দলের কেউ আমার বোটে ফুটো করেছে, এ আমি বিশ্বাস করি না। তবে আমার ব্যক্তিগত শত্রু বলে যদি কাউকে বোঝাতে হয়, তাহলে বুড়ো অ্যারন গিলবার্টের নাম বলা যেতে পারে। ওর আর আমার পরিবারের মধ্যে শত্রুতা সেই ক্যাপ্টেন কুকের দ্বীপটা আবিষ্কারের সময় থেকে। ক্যানারি ইনের মালিক ও। অথচ আগে ওটার মালিক ছিল আমার দাদা। গত ১০ বছরে ওই ইনের মালিকানা নিয়ে দুবার মামলা করেছি, আদালতে দৌড়াতে হয়েছে আমাকে। স্বাস্থ্য আইন অমান্য করার কারণে চূড়ান্ত মৌসুমের সময় একবার মাত্র ইনটা বন্ধ করাতে পেরেছি, তা-ও এক সপ্তাহের জন্য। তারপর শেরিফ হওয়ার ইলেকশনে আমার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিল, হেরেছে জঘন্যভাবে। হ্যাঁ, বাক উইনারের শত্রু খুঁজে যদি বের করতে চাও, তো অ্যারনের ওপর নজর রাখতে পারো।'

'রবিন, তুমি কী বলো?' দুই হাত কোমরে রেখে জিজ্ঞেস করল কিশোর। 'কয়েকটা জায়গা থেকে

খোজখবর শুরু করতে পারি আমরা। এখনই কাজে লেগে পড়ব নাকি?'

'তা পড়া যায়', বলে শেরিফের দিকে তাকাল রবিন। 'বাক, আমাদের ছাড়া একা একা বোটটা মেরামত করতে পারবেন?'

নাক টেনে শব্দ করলেন শেরিফ। হাত নেড়ে ওদের যেতে ইশারা করলেন।

কিশোরের দিকে তাকাল রবিন, 'আমরা তাহলে যেতে পারি।'

গ্রামের দিকে রওনা হলো দুজনে। সরাইখানায় এসে, সিঁড়ি বেয়ে উঠে এল ঘের দেওয়া মস্ত বারান্দাটায়। ভেতরে ঢুকল।

দেখে অনুমান করল কিশোর, সরাইখানার বয়স কম করে হলেও ১০০ বছর হবে। লবিতে ফায়ারপ্লেসের পাশে রেখে দেওয়া হয়েছে পুরু গদিমোড়া পুরোনো আমলের কয়েকটা সোফা আর চেয়ার। ১৭-১৮ বছরের একটা ছেলে হাতে একগাদা ভাঁজ করা তোয়ালের বোঝা নিয়ে এল। কিশোরদের দেখে থামল। 'হাই, আমি টনি। আজকেই ফেরি থেকে নামতে দেখেছি তোমাদের। থাকার জন্য কি এই সরাইখানায় উঠেছ?'

কিশোর জানাল, ওরা এমিলি জনসনের বাড়িতে উঠেছে। মিস্টার অ্যারন গিলবার্ট আছেন কি না জিজ্ঞেস করল। টনি জানাল, 'ডিনারের সময় আসবেন। এখানে যদি খেতে চাও, অসুবিধে নেই। খাওয়ার জন্য এখানকার গেস্ট হতে হবে না। পারিবারিক পরিবেশ তৈরি করতে চাই আমরা, মানুষকে সেটা জানাতে চাই। বিকেলে ক্যানারি ইনে যে কেউ এসে খেতে পারে, আড্ডা দিতে পারে। কোনো বাধা নেই।'

'পলি বার্জেনকে চেনো?' জিজ্ঞেস করল রবিন।

'নিশ্চয়ই। প্রতিবছর দলবল নিয়ে এসে আমাদের সরাইখানাতেই তো ওঠে।' তোয়ালের বোঝা হাতবদল করল টনি, এক হাত থেকে অন্য হাতে নিল। 'যাই, কাজ পড়ে আছে। তোমাদের সঙ্গে পরে দেখা করব। ছয়টায় ডিনার দেওয়া হবে। ঘণ্টা শুনলেই বুঝতে পারবে।' আর কিছু না বলে দ্রুত পায়ে সিঁড়ির দিকে চলে গেল ও।

'ছয়টা বাজতে এখনো দুই ঘণ্টা দেরি আছে', ঘড়ি দেখে বলল রবিন। 'বাড়ি গিয়ে, গোসল সেরে, মুসাকে নিয়ে ফিরে আসার যথেষ্ট সময় পাব।'

'এখনো সুস্থ হয়েছে কি না, খেতে পারবে কি না, কে জানে', কিশোর বলল।

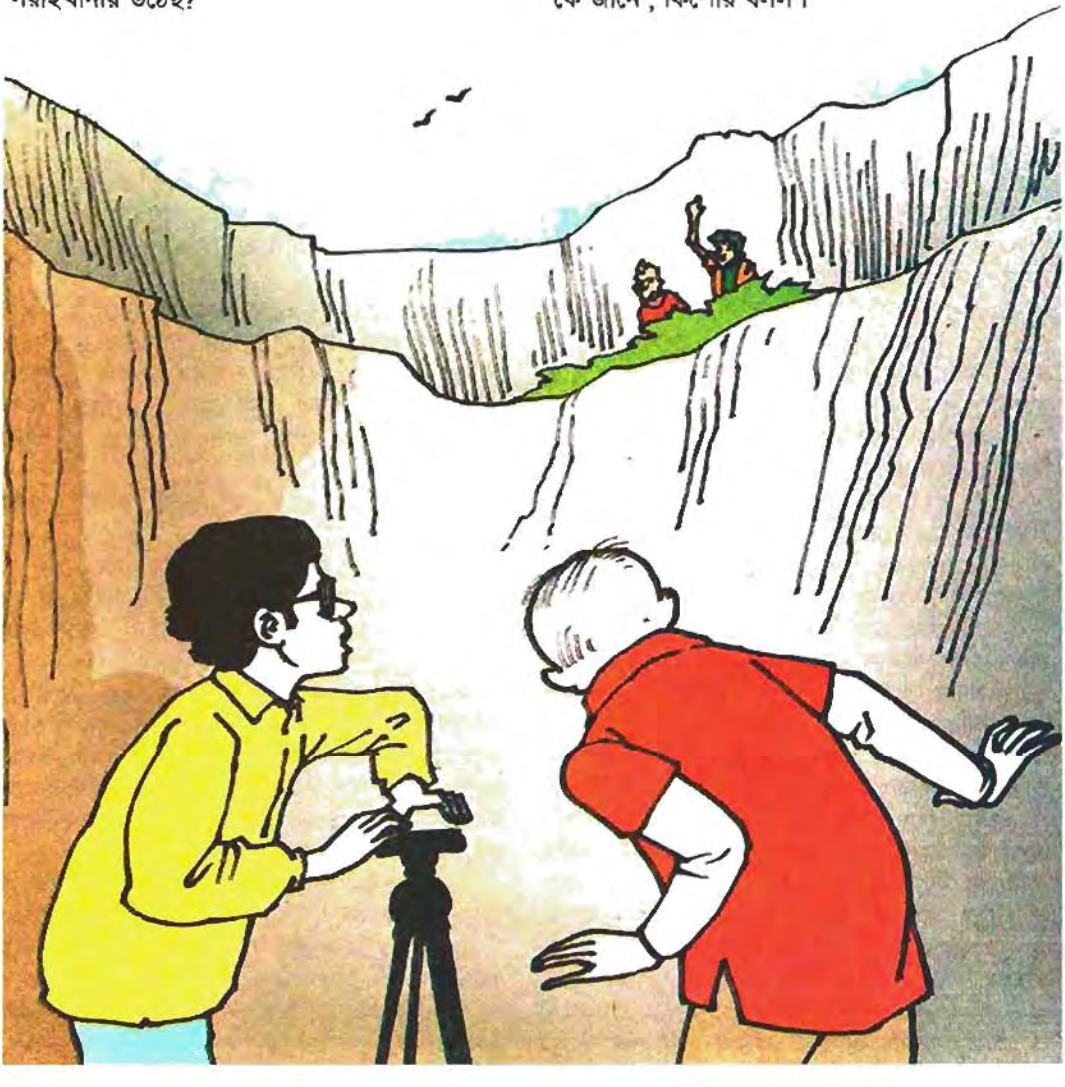

হাসল রবিন। 'পারলে একাই ১০ জনের খাবার খাবে। যে সময়টুকু খেতে পারেনি, সেটা পুষিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করবে না?'

বাড়ি ফিরে ওরা দেখল, অনেক সুস্থ হয়ে গেছে মুসা। গোসল সেরে, কাপড় বদলে, মুসাকে নিয়ে বেরোল। হাঁটতে হাঁটতে রবিন বলল, 'কথা বলার জন্য এখানে অনেক পরিশ্রম করতে হয়। রকি বিচে হলে একটা ফোনেই যে কাজটা করে ফেলা যেত, সেটার জন্য এখানে অনেক বেশি হাঁটতে হবে।'

সরাইখানায় যখন পৌঁছাল ওরা, সাগরের পানির ওপর সোনালি হতে আরম্ভ করেছে তখন সূর্যটা। ডাইনিংরুমে ঢুকে তাজা খাবারের গন্ধ পেল। খোলামেলা বেশ বড় একটা ঘর, সাগরের দিকে মুখ করা। কিশোর লক্ষ করল, ঘরের লম্বা লম্বা কাঠের বেঞ্চগুলোর অর্ধেকেরও বেশি খালি।

কিশোরদের পাশ কাটাল অ্যাকর্ন সোসাইটির সদস্যরা। রান্নাঘরের দরজার পাশের একটা টেবিলে বসল। সোসাইটির প্রধান পলি বার্জেনকে চিনতে অসুবিধে হলো না কিশোরের।

রান্নাঘর থেকে একজন ওয়েট্রেসকে রান্না করা মাছের বারকোশ হাতে বেরোতে দেখে নাক কোঁচকাল পলি। 'এসব মরা প্রাণী খেয়ে কীভাবে যে নিজের দেহটাকে দূষিত করে ফেলছে, বোকাগুলো বোঝেও না।'

ওর কথায় সরাইখানার কর্মচারীদের বিরক্ত মনে হলেও কোনো প্রতিবাদ করল না।

কিশোরদের কাছ থেকে অর্ডার নিয়ে খাবার আনতে চলে গেল টনি। চারপাশে তাকাল রবিন। সি স্টারে চার বাচ্চাওয়ালা যে পরিবারকে দেখেছিল, তাদেরও এখানে দেখা গেল। একটা বাচ্চা ওর দিকে তাকিয়ে হাত নাড়ল। দূরের একটা টেবিলে সেই এশিয়ান দম্পতিকেও দেখতে পেল। হাত ধরাধরি করে বসেছে, হাসিমুখে বারবার তাকাচ্ছে পরস্পরের দিকে।

'নিজেদের নিয়ে একেবারে তন্ময় হয়ে আছে', নিচুস্বরে বলল রবিন।

ঘরের অন্য প্রান্তে স্যুট পরা লোক দুজনকে দেখতে পেল কিশোর, বোটের কেবিনে যাদের দেখেছিল। আরও ধোপদুরস্ত পোশাক পরেছে এখন। সাদা হাওয়াই শার্ট, গলার কাছের বোতামটা খোলা।

কিশোরদের জন্য ট্রেতে করে খাবার নিয়ে এল টনি। রোল, উনুনে ঝলসানো আলু, মাখন মাখানো ভুট্টার আটার রুটি, রান্না করা তাজা কড মাছ। খাবার দেখে আকর্ণ বিস্তৃত হলো মুসার হাসি। দুই হাতের তালু ডলতে ডলতে বলল, 'বাহ্, পেটের রোগীর জন্য ফার্স্টক্লাস খাবার। ডাক্তার দেখালে এই পথ্যই দিত।'

খাওয়া শেষ করে উঠে দাঁড়াল কিশোর। 'পলি বার্জেনের সঙ্গে কথা বলার সময় হয়েছে।' পলির টেবিলের দিকে এগোল ও। টেবিলের কাছে এসে সদস্যদের উদ্দেশে বলল, 'হ্যালো, আমি কিশোর পাশা। দুপুরে বন্দরের যাওয়ার পথে আমাদের দেখা হয়েছে।' পলির দিকে তাকাল। 'তখন আমার বন্ধুকে যা বলেছিলেন আপনি, সেটা আমার ভালো লেগেছে।'

'সত্যি?' হঠাৎ হাসিতে কোমল হয়ে গেল পলির ত্রিকোণ মুখটা।

'শুনলাম, আপনারা একটা দল করেছেন, নাম দিয়েছেন অ্যাকর্ন সোসাইটি', কিশোর বলল।

'হ্যাঁ। আমি ওটার প্রেসিডেন্ট', পলি বলল। 'আমিই এর উদ্যোক্তা। মানুষকে বোঝানোর চেষ্টা করছি, এই গ্রহটা আমাদের, এর নিরাপত্তা দেওয়ার দায়িত্বও আমাদের। পৃথিবীর পরিবেশই যদি ঠিক না থাকে, আমরা বাঁচব কীভাবে? সুতরাং নিজেদের ভালো থাকার খাতিরেই এটাকে ভালো রাখতে হবে আমাদের।'

'মানুষকে বোঝানোর সঙ্গে সঙ্গে গবেষণাও করে থাকি আমরা', পলির কথার সঙ্গে যোগ করল ওর পাশে বসা একজন লোক, সারা মুখ লাল তিলে ভর্তি। 'আমরা আবিষ্কারের চেষ্টা করছি, কতটা হালকাভাবে চললে পৃথিবী কম কষ্ট পাবে।'

'দারুণ তো', কিশোর বলল।

'তোমার ভালো লেগে থাকলে আগামীকাল আমাদের সঙ্গে ক্যাথেড্রাল ফরেস্টে যেতে পারো', পলি বলল, 'দ্বীপের দানবীয় ওক গাছগুলো যেখানে জন্মেছে। খুব সকালে উঠে চলে যাব আমরা, বনতলটা পরীক্ষা করে দেখার জন্য। মানুষের বনে ঢোকার জন্য সকালবেলাটাই সবচেয়ে ভালো। অন্য সময় ঢুকলে ছোট ছোট প্রাণীদের খাবার প্রণালিতে বাধা সৃষ্টি হবে, সেটা কিভাবে জানো?'

'না, জানি না', কিশোর বলল।

'বেশির ভাগ মানুষই জানে না, সেজন্যই তো তাদের শেখাতে চাই।'

'ও, হ্যাঁ হ্যাঁ...খুব ভালো, খুব ভালো!' মাথা ঝাঁকিয়ে হেসে বলল কিশোর। 'আমার দুই বন্ধুও হয়তো আমার সঙ্গে আসতে চাইবে। কোনো অসুবিধে আছে?'

'আরে এ তো খুব ভালো কথা, অসুবিধে কী?' খুশি হয়ে বলল পলি। 'সকাল ছয়টায় আমাদের সঙ্গে দেখা কোরো। গায়ে কোনো ধরনের সানস্ক্রিন কিংবা পোকামাকড় নিরোধক ওষুধ মেখো না, প্লিজ। এসব ওষুধ ওকগাছের ওপর ভয়ানক বিরূপ প্রতিক্রিয়া করে।'

'ছয়টা, তাই তো?' অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে বলল কিশোর।

'ওই সময় বন খুবই সুন্দর অবস্থায় থাকে। আর তা ছাড়া তখন প্রাণিদের বিরক্ত না করেও সবকিছুই খুব ভালোমতো পর্যবেক্ষণ করা যায়, বুঝলে?' হেসে বলল পলি।

মাথা ঝাঁকাল কিশোর। ফিরে এল নিজেদের টেবিলে। এত ভোরে ঘুম থেকে উঠে বনে যাওয়ার কথা বলে এসে মনে মনে নিজেকে গালমন্দ করতে লাগল। তবে, পলি বার্জেনের ওপর নজর রাখতে হলে এর চেয়ে ভালো উপায়ও নেই। দ্বীপটা সম্পর্কে নিশ্চয় খুব উঁচু ধারণা মহিলার।

'রবিন কই?' মুসাকে একা বসে থাকতে দেখে জিজ্ঞেস করল কিশোর।

এক টুকরো বেশ বড় সাইজের চকলেট কেক নিয়ে ব্যস্ত মুসা। মুখ ভর্তি খাবার চিবোতে গিয়ে কথা বলতে পারল না ঠিকমতো, হাত তুলে ডাইনিংরুমের দরজা দেখাল।

'থাক, আর বলার দরকার নেই,' কিশোর বলল। 'আমি বুঝতে পেরেছি।' খোলা দরজা দিয়ে লবিতে বেরিয়ে এল ও। ওখানে রবিনকে দেখল, সাদা চুলওয়ালা একজন বুড়ো মানুষের সঙ্গে কথা বলছে। পাশে রাখা কাঠের স্তূপ থেকে ফায়ারপ্লেসে কাঠ ফেলে আগুনটাকে উসকে দিচ্ছেন বৃদ্ধ।

'এই যে, আমার বন্ধু কিশোর, মিস্টার গিলবার্ট, যার কথা আপনাকে বলেছিলাম', পরিচয় করিয়ে দিল রবিন।

কিশোরের দিকে তাকিয়ে গম্ভীর ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকালেন মিস্টার গিলবার্ট। 'বাকের বোটে কী হয়েছিল, আমাকে বলেছে তোমার বন্ধু। খুব খারাপ, খুবই খারাপ ব্যাপার।'

উবু হয়ে একটা লম্বা কাঠ তুলে ফায়ারপ্লেসের আগুনে খোঁচা দিল কিশোর। সাহায্য করল মিস্টার গিলবার্টকে। এত বড় একটা ফায়ারপ্লেসে আগুন ধরাতে অনেক লাকড়ি দরকার। 'মিস্টার গিলবার্ট', কিশোর বলল, 'শুনলাম, শেরিফ বাক উইনার আর আপনার মধ্যে একটা বিশ্রী রকমের পারিবারিক বিরোধ আছে। কথাটা কি ঠিক?'

অবাক মনে হলো বৃদ্ধকে। 'তার মানে তুমি নিশ্চয় বলতে চাও না, আমিই বাকের বোটে ফুটো করে রেখেছিলাম। আমি ওই ধরনের বাজে কাজ করি না। বাক আর আমার মধ্যে একটা বিরোধ আছে, ঠিক, কিন্তু বোট হলো একজন মানুষের জীবন ধারনের উপায়। বোট খোয়ানোর মানে আমার জানা আছে। আমার মনে হয়, বাইরের কোনো শত্রু এ অপরাধগুলো করছে।'

'সেই একই শত্রু, যে চিংড়ির বয়াগুলো কেটে দিচ্ছে?' রবিনের প্রশ্ন। 'কয়েক মাস ধরে ঘটছে না এটা?'

একটা কাঠ দিয়ে আগুন খোঁচাতে লাগলেন মিস্টার গিলবার্ট। কিছুক্ষণ পর বললেন, 'হ্যাঁ, তোমার কথা বুঝেছি। বাইরের লোক সাধারণত দ্বীপে আসে এপ্রিলের শেষ দিকে, একমাত্র পলি বাদে, এবার সে আগেই চলে এসেছে, সম্ভবত মার্চে এসেছে ও।'

নিজের হাতের কাঠের টুকরোটার দিকে তাকাল কিশোর। 'অদ্ভুত তো', আনমনে বলে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে গভীর মনোযোগে টুকরোটাকে পরীক্ষা করতে লাগল ও। 'কিছু একটা লেখা রয়েছে এটাতে।'

'কী লেখা?' দ্বিধান্বিত মনে হলো মিস্টার গিলবার্টকে।

কিশোরের কাঁধের ওপর দিয়ে উঁকি দিয়ে লেখাটা পড়ল রবিন, 'হ্যারি'।

'হ্যারি!' হাঁ হয়ে গেলেন বৃদ্ধ। 'তা কী করে হয়?' কাঠ দিয়ে আগুন খোঁচানো বন্ধ করলেন না। চেহারায় কেমন একটা অসুস্থ ভাব ফুটে উঠেছে। 'তার মানে এগুলো আগুন জ্বালানোর কাঠ নয়। হ্যারির চিংড়ির খাঁচা ভেঙে ফেলে ফায়ারপ্লেসের কাঠ হিসেবে চালিয়ে দেওয়া হয়েছে। আজ সকালে এই খাঁচাগুলোই তো চুরি গেছে!'

চার

'আরে শোনো শোনো', ওঁর দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাতে দেখে তাড়াতাড়ি চেঁচিয়ে উঠলেন মিস্টার গিলবার্ট, 'আমি এ কাজ করিনি। সত্যি বলছি! হ্যারি আমার বন্ধু। আমার কথা বিশ্বাস না হলে ওকে গিয়েই জিজ্ঞেস করো।'

'থাক থাক, শান্ত হোন', মিস্টার গিলবার্ট উঠে দাঁড়াতে যাচ্ছিলেন দেখে তাড়াতাড়ি বলল রবিন। 'আমরা আপনাকে সন্দেহ করছি না।'

'যে কেউ এসে এই কাঠের টুকরোটা এখানে ফেলে যেতে পারে', মিস্টার গিলবার্ট বললেন। 'আমি কী করে জানব এটা কারও ফাঁদ-ভাঙা কাঠের টুকরো? ফায়ারপ্লেসের লাকড়ি তো আর পরীক্ষা করে দেখতে যায় না কেউ, আমি অন্তত দেখি না।'

'সাধারণত কে আপনার লাকড়ি সরবরাহ করে?' কিশোর জিজ্ঞেস করল।

'বুস্টার মরিসন', মিস্টার গিলবার্ট জানালেন। 'সি স্টারে আসা মালপত্র বহন করে ও। কিন্তু বুস্টারকে আমার সন্দেহ হয় না...'

'কিসের সন্দেহ?' পেছন থেকে বলে উঠল একটা কণ্ঠ। ফিরে তাকিয়ে কিশোর দেখল, দরজায় দাঁড়িয়ে

আছে বুস্টার, কোঁচকানো ভুরু। চেককাটা শার্টের হাতা গোটানো, দেখে মনে হচ্ছে সারাটা দিন কঠোর পরিশ্রম করে এসেছে।

'বুস্টার', রুক্ষকণ্ঠে মিস্টার গিলবার্ট বললেন, 'এগুলো জ্বালানি কাঠ নয়। হ্যারির চিংড়ির ফাঁদের কাঠ। কেউ কেটে ফেলেছে। এগুলো এখানে এল কী করে?'

'আমাকে জিজ্ঞেস করে লাভ নেই, মিস্টার গিলবার্ট', মাথা নাড়ল বুস্টার। দুই গোয়েন্দার দিকে তাকাল একবার। 'এ দ্বীপের সবাই পাগল হয়ে গেছে।'

'সরাইখানায় এই কাঠগুলো কি আপনি এনেছেন?' বুস্টারকে জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'নিশ্চয়ই', বুস্টার বলল। 'এখানকার সমস্ত জ্বালানি কাঠ সব সময় আমিই দিয়ে যাই। এগুলোও আমিই এনেছি। এর মধ্যে অস্বাভাবিক কিছু দেখিনি।' অ্যারনের দিকে তাকিয়ে বলল, 'দেখুন, আমি গোলমাল এড়িয়ে থাকতে চাই। এমনিতেই বাঁচার জন্য খাটতে খাটতে অস্থির, কারও ফাঁদ চুরি করার সময় কোথায়? সারাটা দিন কাজ করেছি, এখনো শেষ হয়নি।'

'ক্যানারি আইল্যান্ডে রাত আটটার পর কি কাজ করেন আপনি?' জানতে চাইল কিশোর।

'সেটা তোমাকে বলব না', রেগে উঠল বুস্টার। 'কাউকেই বলব না।' তারপর দুপদাপ করে পা ফেলে বেরিয়ে গেল লবি থেকে।

ওর পিছু নেওয়ার ইচ্ছে ছিল কিশোরের, কিন্তু গেল না, পায়ে হেঁটে বুস্টারের ট্রাকের সঙ্গে পারবে না ও। তা ছাড়া অন্ধকার হতেও দেরি নেই।

'কী যে বাজে অবস্থা,' মিস্টার গিলবার্ট বললেন। 'শিগগিরই এসব ঝামেলার একটা কিনারা করা না গেলে, দু-এক বছরের মধ্যেই ক্যানারি আইল্যান্ড জনমানবহীন একটা মরুদ্বীপে পরিণত হবে।'

উঠে দাঁড়ালেন তিনি। সরাইখানায় আসা নতুন অতিথিদের থাকার ব্যবস্থা করতে চললেন। তাঁকে গুডবাই জানিয়ে লবি থেকে বারান্দায় বেরিয়ে এল কিশোর ও রবিন। নিচুস্বরে রবিন বলল, 'কেউ দ্বীপটাকে মরুদ্বীপই বানাতে চাইছে।'

'কিন্তু কেন?' নিজেকেই যেন প্রশ্ন করল কিশোর। চারপাশের অলস দৃশ্যের দিকে তাকাল। আকাশটা উজ্জ্বল কমলা, লাল আর গোলাপি রঙে রাঙিয়ে দিয়েছে ডুবন্ত সূর্য। সাগরের পানির দিকে ঢালু হয়ে নেমে যাওয়া লনটায় সূর্যাস্ত দেখতে জড়ো হয়েছে একদল কম বয়সী ছেলেমেয়ে, ওদের গায়ে ক্যানারি ইনের কর্মচারীর শার্ট। মুসাকেও ওখানে দেখতে পেল কিশোর। রবিনকে নিয়ে ওর কাছে এসে দাঁড়াল। যা যা ঘটেছে, মুসাকে জানাল ওরা। স্থানীয় গুজবের আলোচনা শুনে তথ্য জানার আশায় ওখানে বসল তিনজনে, সূর্য ডুবে অন্ধকার না হওয়ার পর্যন্ত বসে রইল। কালো আকাশে তারা ফুটতে লাগল। কিন্তু তদন্ত এগিয়ে নেওয়ার মতো কোনো সূত্র জানতে পারল না।

বাকি সবাই যখন ভেতরে চলল ফায়ারপ্লেসের সামনে বসে গিটার বাজিয়ে গান গাওয়ার জন্য, কিশোররা তখন ওদের কাছে বিদায় নিয়ে ফিরে চলল পাহাড়ে, এমিলির বাড়িতে। কিশোর বলল, 'ভাগ্যিস টর্চ নিয়ে এসেছিলাম। নইলে যা অন্ধকার, পথ দেখে আর বাড়ি ফিরতে পারতাম না।' পকেট থেকে টর্চ বের করে জ্বালল ও।

এমিলির বাড়িতে ঢুকে কেরোসিনের বাতি জ্বালাল ওরা। শুতে যাওয়ার আগে রহস্যটা নিয়ে আলোচনায় বসল কিশোর ও রবিন। 'কী মনে হয় তোমার', কিশোরকে প্রশ্ন করল রবিন, 'মিস্টার গিলবার্ট নিশ্চয় হ্যারির ফাঁদগুলো চুরি করেননি, তাই না? খুব ভালো মানুষ বলেই তো মনে হলো তাঁকে।'

'ভুলে গেছ, রবিন', কিশোর জবাব দিল, 'এর আগে কত "ভালো মানুষকে" আমরা জেলে যেতে সাহায্য করেছি।'

'তা ঠিক,' মাথা ঝাঁকাল রবিন।

'এই, একটা কুকি খেলে কেমন হয়?' বেডরুমের দরজা থেকে বলল মুসা। হাতে একটা বড় প্যাকেট। 'এগুলো আমাদের ভাবতে সাহায্য করবে।'

'মুসা, তুমি একটা জিনিস', হেসে বলল রবিন। 'এইমাত্র পেটভর্তি ডিনার খেয়ে এসে আবার কীভাবে খাও?'

'খুব সোজা', নির্বিকার ভঙ্গিতে জবাব দিল মুসা, 'চিবিয়ে শুধু গিলে ফেলা।' বলে, একটা কুকি বের করে কামড় দিয়ে আধখানা ভেঙে মুখে ফেলল। 'কথাবার্তা এখন আর ভালো লাগছে না আমার। আমি শুতে চললাম।' ঘুরে দাঁড়িয়ে নিজের ঘরে চলে গেল ও।

'হ্যাঁ, যা বলছিলাম', আগের কথায় ফিরে এল কিশোর, 'বাকের বোটে ফুটোটা যে করেছে, সে-ই বাকি অঘটনগুলোও ঘটাচ্ছে, তা-ই বা কী করে বলি? হয়তো আলাদা আলাদা লোকের কাজ।'

'আসলেই কি তাই?' ভুরু নাচাল রবিন। 'ছোট্ট দ্বীপ, এত ছোট একটা জায়গায় একদল অপরাধী রয়েছে, তা কি বিশ্বাস করা যায়?'

'তা অবশ্য ভুল বলোনি', চিন্তিত ভঙ্গিতে জবাব দিল কিশোর। 'তবে, একটা কথা ঠিক। দ্বীপটার পরিবেশ ধ্বংস করার জন্য একজন খারাপ লোকই যথেষ্ট। আর কোন লোকটা এসব করছে, জানার জন্য ছয় দিন সময় আছে আমাদের হাতে।'

ঘড়িতে অ্যালার্ম দিয়ে রেখেছিল রবিন, পরদিন কাকভোরে উঠে পড়ল। কিশোর গিয়ে মুসাকে ডাকতেই বিরক্ত ভঙ্গিতে বলল ও, 'উফ্, সত্যিই যাচ্ছ তাহলে? এত ভোরে ঘুম থেকে উঠে বনের মধ্যে গিয়ে লাভটা কী?'

'দেখি, কী লাভ হয়', কিশোর বলল, 'তবে যেতে হবে। আর মনে রেখো, সানস্ক্রিন কিংবা পোকামাকড়ের ওষুধ গায়ে মাখা চলবে না।'

মুসা বিড়বিড় করল, ঘোঁত ঘোঁত করল, প্যান প্যান করল, তবে দ্রুত এক বাটি সিরিয়াল খাওয়ার পর কিছুটা শান্ত হলো। এমিলির বাড়ির পেছনে, নিচের ঘাসে ঢাকা সবুজ জায়গাটা দিয়ে এগিয়ে চলল ওরা। সকালটা এতই ঠান্ডা, নাক দিয়ে বেরোনো নিঃশ্বাসের বাতাসও ধোঁয়ার মতো দেখতে পাচ্ছে।

ক্যানারি আইল্যান্ডের ম্যাপ খুলে কিশোর বলল, 'আমাদের ভাগ্য ভালো, এখান থেকে খুব কাছেই ক্যাথেড্রাল ফরেস্ট। দুই মাইলেরও কম।'

কাঠের সাইনবোর্ড লাগানো আছে। সেগুলো অনুসরণ করে সরু একটা রাস্তায় এসে পড়ল ওরা। রাস্তাটা ঢুকে গেছে পাইনের বনের মধ্যে।

'গাড়ি নেই, যানবাহন নেই', হাঁটতে হাঁটতে রবিন বলল, 'চমৎকার এক নৈশব্দ। সত্যিকার বনের নীরবতা কাকে বলে ভুলেই গিয়েছিলাম।'

নির্মল সৌন্দর্যের বন ক্যাথেড্রাল ফরেস্ট। লম্বা লম্বা পাইন আকাশে মাথা তুলে রেখে এই রৌদ্রালোকিত সকালেও অন্ধকার, আরামদায়ক এক পরিবেশ সৃষ্টি করে রেখেছে। সবুজ শেওলা যেন কার্পেট বিছিয়ে রেখেছে বনতলে। পড়ে থাকা গাছগুলোর গা-ও সবুজ করে দিয়েছে।

'চারপাশের গাছগুলোর বেড় দেখো', কিশোর বলল। 'এত্ত মোটা। অনেক পুরোনো এই বন।'

ওদের আগেই চলে এসেছে পলি আর তার দলবল। বেশির ভাগেরই মাথা নোয়ানো, দৃষ্টি নিচের দিকে। গভীর মনোযোগে মাটি পরীক্ষা করছে।

'গুড মর্নিং', ওদের কাছে এসে কিশোর বলল।

'কেমন আছেন আপনারা?' জিজ্ঞেস করল রবিন।

কিন্তু ওদের সম্ভাষণের জবাবে ঠোঁটে আঙুল ঠেকিয়ে আতঙ্কিত ভঙ্গিতে 'শ্‌শ্‌শ্‌' করে উঠল পলি। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল।

ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গিয়ে পরস্পরের দিকে তাকাতে লাগল কিশোর, মুসা, রবিন।

পলির দলের একজন ফ্যাকাশেমুখো মহিলা, বয়স ৫০-এর মতো হবে, পা টিপে টিপে এগিয়ে এল ছেলেদের কাছে। নীরবে মৃদু হেসে ফিসফিস করে বলল, 'আমরা শুনছি।'

মহিলার দিকে কিছুটা অবাক হয়েই তাকিয়ে রইল রবিন। তারপর কিশোরের দিকে তাকাল, তারপর মুসার দিকে, তারপর আবার মহিলার দিকে। ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল, 'কী শুনছেন?'

'বনের শব্দ', মহিলা জবাব দিল যতটা সম্ভব নিচুস্বরে। 'এখানে যাদের বাড়ি, তাদের বিরক্ত করতে চাই না আমরা। বনের প্রতিটি শব্দই একটি করে মেসেজ।'

'বুঝলাম', ফিসফিস করে বলে, পা টিপে টিপে একটা গাছের কাছে গিয়ে ওটার দিকে তাকিয়ে রইল রবিন।

'কী করব আমরা এখন?' অধৈর্য ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করল মুসা।

'শ্‌শ্‌শ্‌!' আবার দেখা গেল পলির প্রতিক্রিয়া।

গাছটাতে কিছুই দেখতে পেল না রবিন। কিছু শুনলও না। কাঁধ ঝাঁকিয়ে কিছুটা বোকার মতোই অ্যাকর্ন সোসাইটির সদস্যদের মতো কান পেতে দাঁড়িয়ে রইল। কেউ কথা বলছে না, কেউ নড়ছে না, মাঝে মাঝে গম্ভীর ভঙ্গিতে শুধু হাতের ছোট প্যাডে নোট লিখছে নীরবে।

এই অবস্থা বেশিক্ষণ সহ্য করতে পারল না। আর কোনো কাজ না পেয়ে পকেট থেকে একটা আপেল বের করে খেতে শুরু করল মুসা।

'এই ছেলেগুলোকে বিশ্বাস হয় তোমার?' বিড়বিড় করে পলিকে জিজ্ঞেস করল একটা লোক, যার মুখভর্তি লাল তিল, আগের দিন সরাইখানার ডাইনিংরুমে এই লোকটাই পলির পাশে বসেছিল। কী বলতে চাইছে ও, বুঝতে পারল না রবিন। মুসা শুধু একটা আপেল খাচ্ছে, এতে কী এমন মহা ক্ষতি হয়ে গেল।

কারও কোনো তোয়াক্কা না করে আপেল কামড়ে চলল মুসা। খেতে খেতে শেষ পর্যন্ত শুধু ভেতরের ছোট্ট শাঁসটা রইল। একটা ঝোপের মধ্যে ছুড়ে ফেলে দিল ওটা।

চোখের কোণ দিয়ে সেটা দেখতে পেল পলি। সঙ্গে সঙ্গে ঝট করে সোজা হয়ে গেল ও, চোখে দেখা দিল আতঙ্ক। রাগতস্বরে ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল, 'কী কাজটা করলে তুমি বুঝতে পারছ?'

দ্বিধান্বিত ভঙ্গিতে মুসা জবাব দিল, 'একটা আপেল খেয়েছি।'

কঠিন দৃষ্টিতে দীর্ঘ একটা মুহূর্ত ওর দিকে তাকিয়ে রইল পলি। আরেকজন মহিলা তাড়াতাড়ি গিয়ে ঝোপ থেকে শাঁসটা কুড়িয়ে নিয়ে এল। ঝোপ থেকে বেরিয়ে এসে বলল, 'ভয় নেই, পলি, জিনিসটা আমি পেয়েছি।' শাঁসটাকে দুই আঙুলে টিপে ধরে এমনভাবে দেখাল, যেন একটা মরা ইঁদুর। 'এটাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাচ্ছি আমরা।'

'অ্যাকর্ন সোসাইটির প্রথম নিয়মটাই হলো জায়গা নোংরা করা চলবে না', মুসার দিকে ঘৃণার দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল পলি।

'কিন্তু', এতক্ষণে কথা বলল কিশোর, 'ঝোপের মধ্যে একটা আপেলের শাঁস ফেললে জায়গা নোংরা হয় না। কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই ওটা ভেঙে মাটিতে মিশে যেত।'

'তোমার তাই মনে হচ্ছে?' পলি বলল, 'কী বোকা! ওই শাঁস ফেলার পরিণতি কী হতে পারে কল্পনায়ও আসেনি তোমার। ধরো, কোনো একটা দুর্ভাগা হরিণ এসে যদি ওটা খেয়ে ফেলত?'

'আপেলের শাঁস খেলে হরিণের কোনো ক্ষতি হয় না', রবিন জবাব দিল।

'ভুল বললে, মাই ডিয়ার ফ্রেন্ড', বলল লাল তিলওয়ালা লোকটা। 'একটা আপেলের শাঁসই এই পুরো বনের পরিবেশের ভারসাম্য বদলে দিতে পারে। একটা শাঁস খেয়ে লোভে পড়ে যদি প্রতিদিন খাওয়ার জন্য চলে আসে হরিণটা? আর তো খুঁজে পাবে না, তাই না?'

'কিংবা এমনও হতে পারে, অন্য কোনো প্রাণী, যেটা এ বনের অধিবাসী নয়, শাঁসের লোভে ঝোপে ঢুকে পড়ল, তাহলে কী হবে?' পলি যোগ করল।

কিছুই বুঝতে না পেরে মাথা গরম হয়ে গেল মুসার। বলল, 'ঠিক আছে ঠিক আছে, আপনাদের কথা বুঝতে পেরেছি। তবে আপনারা কি একটু বেশি দুশ্চিন্তা করছেন না?'

'আমাদের গ্রহটাকে রক্ষা করার কতটা ইচ্ছে আছে তোমার?' শীতল কণ্ঠে বলল পলি। 'খুব বেশি বলে তো মনে হয় না।'

'দেখুন', এত অভিযোগ সহ্য করতে পারল না মুসা, 'আমার শাঁসটা যদি আমাকে নিয়ে যেতে দেন, তো খুব খুশি হই, ঠিক আছে?'

জোরে মাথা নাড়ল সেই মহিলা, যার কাছে শাঁসটা রয়েছে। 'সরি, আর তোমাকে বিশ্বাস করতে পারি না,

যে-কাণ্ডজ্ঞানহীন কাজটা করলে।'

'আপেলটা আমি খেয়েছি, ওটার শাঁসটার ব্যবস্থাও আমিই করব', বলে মহিলার হাত থেকে ছোঁ দিয়ে শাঁসটা কেড়ে নিল মুসা।

'পলি, যে পাখিটার ওপর নজর রাখছিলাম, ভয় পেয়ে ওটা উড়ে চলে গেছে', অভিযোগের সুরে বলল আরেকজন সদস্য।

'মনে হচ্ছে, অনেক বেশি লোক হয়ে গেছি আমরা', তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কিশোর, মুসা ও রবিনের দিকে তাকিয়ে বলল পলি। 'হয়তো তোমাদের আসতে বলাটাই ঠিক হয়নি আমার। অনেক কিছু শেখা বাকি আছে এখনো তোমাদের। সত্যিই যদি তোমরা শিখতে চাও, অন্য আরেক দিন দেখা যাবে। ভালোমতো শেখার আগে আর তোমাদের ক্যাথেড্রাল ফরেস্টে ঢোকার দরকার নেই, এই বন থেকে দূরে থাকবে।'

দলের বাকি সবাইকে নীরবে ইশারা করল পলি। নিঃশব্দে তাকে অনুসরণ করে সরু রাস্তাটা ধরে চলে গেল ওরা।

'নাহ্, আমার বিশ্বাস হচ্ছে না', দলবল নিয়ে পলি চলে যাওয়ার পর নড়ে উঠল রবিন।

'বেশি বাড়াবাড়ি করে ওরা, তাতে কোনো সন্দেহ নেই', কিশোর বলল। 'আমি আশা করেছিলাম, ক্যানারি আইল্যান্ডের গোলমালগুলোর ব্যাপারে পলিকে কিছু প্রশ্ন করব। এই যেমন, বাকের বোটের গর্ত হওয়া, হ্যারির খাঁচা ভেঙে ফেলা, এসব। এখন তো মনে হচ্ছে, ওকে জিজ্ঞেস করতে বহু সময় লাগবে।'

'শোনো,' মুসা বলল বিরক্ত কণ্ঠে, 'আমি এখন যাই।'

'যাবে?' রবিনের প্রশ্ন। 'কোথায়?'

'বাড়িতে। আপেলের শাঁসটার ব্যবস্থা করতে।'

'মুসা, সত্যিই তুমি এতখানি পথ হেঁটে এমিলির বাড়িতে ফিরে যাবে শুধু একটা আপেলের শাঁস ফেলতে?'

কেমন বোকা বোকা চোখে তাকাল মুসা। 'পরিবেশগত ভারসাম্য নষ্ট করার ব্যাপারে যে ইঙ্গিতটা আমাকে দেওয়া হয়েছে, তাতে আমি সতর্ক হয়ে গেছি। ধরো, কোনো র‍্যাকুন যদি শাঁসটা খুঁজে পায়? কিংবা কোনো শিয়াল?'

'কী হবে তাতে?' ভুরু নাচাল রবিন।

'কী জানি কী হবে, ওরাই জানে', মাথা চুলকাল মুসা। 'তবে বনের ভেতর আর এটা ফেলতে রাজি নই আমি। আন্টির বাড়িতে গিয়ে আবর্জনা ফেলার জায়গায় ফেলব। লাঞ্চের সময় শহরে দেখা হবে, ঠিক আছে? এই সাড়ে বারোটা নাগাদ?'

'তোমার যা ইচ্ছে করো গিয়ে', কিশোর বলল। তবে তার কথা কানে গেল না মুসার। সরু রাস্তাটা ধরে রওনা হয়ে গেছে সে। রবিনের দিকে ফিরল কিশোর। 'খামোকাই এত সকালে উঠলাম। এই কেসে এগোনোর মতো ছোট্ট একটা সূত্রও এখনো পাইনি।' হতাশা প্রকাশ পেল কিশোরের কণ্ঠে।

'হ্যাঁ। এখন আর দুঃখ করে লাভ নেই। বিকেলে আবার তদন্তের সুযোগ পাওয়া যাবে, আশা করি।' ম্যাপের ভাঁজ খুলে দেখতে শুরু করল রবিন। 'তারচেয়ে বরং দ্বীপটা ঘুরে দেখি, চলো। পাহাড়চূড়ার কাছ থেকে বেশি দূরে নেই আমরা।'

'এগোও তাহলে', কিশোর বলল। ক্যাথেড্রাল ফরেস্ট থেকে বেরিয়ে এসে পাহাড়ি রাস্তা বেয়ে ওপরে উঠতে শুরু করল দুজনে। পাথুরে জায়গা। একটা মালভূমিতে উঠে এল ওরা, যেটার উল্টোদিকের কিনার থেকে খাড়া নেমে গেছে পাহাড়ের দেয়াল।

'এ তো সাংঘাতিক!' চূড়ার সৌন্দর্য দেখে বলে উঠল রবিন। কিনারে দাঁড়িয়ে নিচে তাকাল। কয়েক শ ফুট নিচে পাথরের গায়ে আছড়ে পড়ছে ঢেউ। 'খুব সুন্দর!'

'সাবধানে পা ফেলো! পিছলে নিচে পড়লে ছাতু হয়ে যাব।' কিনার দিয়ে উঁকি দিয়ে নিচে তাকাল কিশোর। ওদের নিচে পাক খেয়ে খেয়ে উড়ছে অসংখ্য সিগাল। পাথুরে সৈকতে নিয়মিত ছন্দে আছড়ে পড়ে ভাঙছে ঢেউ। 'এই, দেখো! সেই দুজন লোক, সি স্টারে করে যারা আমাদের সঙ্গে এসেছিল।'

নিচে তাকিয়ে একটা লোককে দেখতে পেল রবিন। পাতলা চুলওয়ালা ছিপছিপে লোকটা পানির কিনারে একটা ট্রাইপড বসাচ্ছে। 'মনে হচ্ছে ছবি তোলার ব্যবস্থা করছে ওরা।'

'সেটাই তো অবাক লাগছে আমার কাছে', কিশোর বলল। গলা বাড়িয়ে দিয়ে আরও ভালোমতো দেখার চেষ্টা করল। 'ট্রাইপডের ওপর কোনো ক্যামেরা দেখতে পাচ্ছি না। তুমি পাচ্ছ?'

'না', সকালের রোদ পড়ছে চোখে, হাত দিয়ে কপাল ঢেকে তাকিয়ে আছে রবিন। 'বসাবে নিশ্চয়। হয়তো ক্যামেরাটা ওদের ব্যাকপ্যাকে আছে।'

চশমাপরা কালো চুলওয়ালা দ্বিতীয় লোকটার হাতে ক্লিপবোর্ডের মতো দেখতে একটা জিনিস। ট্রাইপডের কাছ থেকে পা মেপে মেপে পিছিয়ে যেতে শুরু করল।

'কী করছে ও?' অবাক হয়ে বলল রবিন।

'জিজ্ঞেস করি।' দেয়ালের যতটা সম্ভব কিনারে এসে, দুই হাত মুখের কাছে জড়ো করে হাঁক দিল কিশোর, 'হ্যালো! এই যে, শুনছেন!'

গলায় ঝোলানো দুরবিন তুলে চোখে ঠেকিয়ে ওপরে তাকাল কালো চুলওয়ালা লোকটা। হাত নাড়ল কিশোর আর রবিন। 'ও আমাদের দেখেছে', রবিন বলল। 'সঙ্গীকে বলছে।'

কিন্তু ওদের হাত নাড়ার জবাব না দিয়ে তাড়াতাড়ি জিনিসপত্র গোছাতে শুরু করল লোকগুলো।

'কী করছে?' তাকিয়ে থেকে বলল রবিন।

'নিচে নেমে দেখা দরকার', কিশোর বলল।

'কিন্তু নামব কী করে? এত খাড়াই দেয়াল বেয়ে?' রবিনের প্রশ্ন।

'উল্টোদিক দিয়ে পাহাড়ের গা বেয়ে ঘুরে নামতে হবে। জলদি এসো!'

কিন্তু পাহাড়ের গোড়ায় নেমে ওরা দেখল, লোকগুলো চলে গেছে। দূরে সিকি মাইল দূরে ওদের দেখতে পেল কিশোর, দৌড়ে চলে যাচ্ছে। ছুটতে ছুটতেই ওদের একজন কাঁধের ওপর দিয়ে বারবার ফিরে তাকাচ্ছে। ছোটার গতি আরও বাড়িয়ে দিল।

'দেখে মনে হচ্ছে আমাদের কাছ থেকে পালাতে চায়', কিশোর বলল। ওপর থেকে দৌড়ে নেমে আসার পরিশ্রমে হাঁপাচ্ছে। 'চলো। দেখি, ধরা যায় নাকি।'

ছুটতে ছুটতে দ্বীপের একটা কোণের কাছে চলে এল দুজনে, যে জায়গাটার নাম শিপরেক, যেখানে পুরোনো জাহাজটা ডুবে রয়েছে। কিন্তু লোকগুলোকে আর দেখতে পেল না।

'গেল কোথায়?' এদিক-ওদিক তাকাতে লাগল রবিন।

'ভাবনা নেই', সান্ত্বনা দিল কিশোর। 'এটা একটা দ্বীপ। বেরিয়ে যেতে পারবে না। খুঁজে ওদের বের করে ফেলতে পারব, পরে।'

'এই ডুবে যাওয়া জাহাজটা সত্যিই একটা দেখার মতো জিনিস', রবিন বলল। মালবাহী পুরোনো জাহাজটার ধ্বংসাবশেষের দিকে তাকিয়ে আছে ও। কিশোর বাধা দেওয়ার আগেই জুতো-মোজা খুলে রেখে, প্যান্ট গুটিয়ে নিয়ে পানিতে নেমে পড়ল রবিন। 'আমি ওই জাহাজটায় উঠতে যাচ্ছি।'

'ম্যাপে লিখেছে জাহাজে ওঠা খুব বিপজ্জনক', কিশোর বলল। 'তার মানে কেউ যদি উঠতে চায়, ভীষণ ঝুঁকি নিয়ে উঠতে হবে।' তবে বিপদের ভয় ওকে ঠেকিয়ে রাখতে পারল না। শিগগিরই রবিনের পিছু নিল ও।

'দারুণ কিন্তু', অর্ধেক ডুবে থাকা জাহাজটার কিনার দিয়ে ওপরে উঠে বলল রবিন। একটা বেশ বড় একটা অংশ এখনো পানির ওপর রয়েছে, আর শুকনো। 'নিশ্চয় প্রবল ঝড় জাহাজটাকে পাথরের ওপর আছড়ে ফেলে ডুবিয়ে দিয়েছিল।'

কাত হয়ে থাকা ডেক দিয়ে হেঁটে চলল দুজনে। জাহাজের পেছন দিকে চলে এল। স্বচ্ছ পানিতে নিচের দিকে অনেকখানি দেখা যাচ্ছে। জলজ শ্যাওলা জাহাজের গা আঁকড়ে রয়েছে। জাহাজের মরচে পড়া দেহের ভাঙা ফোকরগুলো দিয়ে অসংখ্য মাছ ঢুকছে আর বেরোচ্ছে। সামনের দিকে ফিরে আসার জন্য ঘুরতেই রবিনের চোখে পড়ল ছোট একটা বাদামি রঙের কাগজের ব্যাগ রেখে দেওয়া হয়েছে জাহাজের কাত হয়ে থাকা পুরোনো খোলের গায়ে, খুব যত্ন করে, এমনভাবে যাতে পানিতে পড়ে না যায়। কৌতূহলী হয়ে ব্যাগটা খুলে দেখেই চেঁচিয়ে উঠল রবিন, 'কিশোর, দেখো,

কী পেয়েছি!'

ভেতরে বাদামি রঙের ছোট একটা শিশি। হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে দেখতে গিয়ে শিশির গায়ে লাগানো লেবেলটা চোখে পড়ল রবিনের। হঠাৎ করেই গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল তার, লোম খাড়া হয়ে গেল।

লেবেলের গায়ে আঁকা মানুষের আড়াআড়ি বসানো হাড়ের ছবির ওপর একটা খুলির ছবি, যে চিহ্ন দিয়ে 'মারাত্মক' বোঝানো হয়। ছবির নিচে লেখা, সাবধান : বিষ! স্যালমোনেলা ব্যাকটেরিয়াম। গিলে ফেললে মারাত্মক বিপদ হবে!

পাঁচ

'জাহাজটা ডোবার কারণটা বোধহয় বুঝতে পারছি!' গম্ভীর স্বরে বলল রবিন। নষ্ট হয়ে যাওয়া পোর্টহোল দিয়ে জাহাজের ভেতরে কী আছে উঁকি দিয়ে দেখছিল কিশোর, রবিনের কথায় ফিরে তাকাল। 'কী ভয়ংকর জিনিস, দেখো!' শিশিটা উঁচু করে ধরল রবিন, যাতে কিশোরও পড়তে পারে। যদি লেবেলে লিখে সাবধান করে দেওয়া না হতো, ভেতরের স্বচ্ছ পানির মতো তরল পদার্থটা দেখে বোঝাই যেত না ওটা বিপজ্জনক, মারাত্মক জীবাণুতে ভর্তি। 'দ্বীপে মনে হয় কোনো কেমিস্ট আছে, যে এসব নিয়ে গবেষণা করে', কিশোর বলল।

'কিসের গবেষণা? ফুড পয়জনিং? আমার মনে হয়ে না', রবিন বলল। 'তা ছাড়া, একজন কেমিস্ট কেন একটা বিষের শিশি ব্যাগে ভরে ভাঙা জাহাজে রাখবে?'

'হয়তো কারও তুলে নেওয়ার জন্য রেখে দিয়েছে।' রবিনের হাত থেকে শিশিটা নিয়ে দেখতে লাগল কিশোর।

'দাঁড়াও, একটা বুদ্ধি এসেছে মাথায়', রবিন বলল। 'এটা আবার আগের জায়গায় রেখে দিয়ে নেমে যাই। চোখ রাখব। কে এটা নিতে আসে হয়তো দেখতে পারব।'

'ঠিক', একমত হলো কিশোর। 'হয়তো কেউ খাবারে এই বিষ মিশিয়ে দিয়ে তাদের অসুস্থ করতে

চায়। বয়ার দাড় কেটে দেওয়ার চেয়ে এটা অনেক বেশি বিপজ্জনক, রবিন। তা ছাড়া কেউ যদি এটাকে অন্য কারও তুলে নেওয়ার জন্য রেখে গিয়ে থাকে, তাহলে বুঝতে হবে দ্বীপে অনিষ্টকারী লোক একজন নয়।'

'ওই দুজনে এটা রেখে যায়নি তো, যারা আমাদের দেখে পালিয়েছিল?' রবিন বলল। 'আমাদেরকে পিছু নিতে দেখে এদিকেই এসেছিল ওরা।'

মাথা ঝাঁকাল কিশোর। 'হতে পারে।' ওরা যখন কথা বলছে, তখন আরেক দিক থেকে একদল ট্যুরিস্টকে জাহাজটার দিকে আসতে দেখা গেল। সেদিকে তাকিয়ে বলল ও, 'অনেকেই এখানে আসে জাহাজটাকে দেখতে। এদের যে কেউ শিশিটা রেখে যেতে পারে।'

'কী করব এখন?' রবিনের প্রশ্ন। 'কে শিশিটা তুলে নেয় দেখার জন্য অপেক্ষা করব?'

মাথা নাড়ল কিশোর। 'আমার মনে হয়, ওসব ঝুঁকির মধ্যে না গিয়ে শিশিটা শেরিফকে দেওয়া দরকার। হয়তো এটা কোনো মূল্যবান সূত্র। যে লোক এই বিষ ব্যবহার করতে চায়, তার হাতে আর পড়তে না দেওয়াই ভালো।'

'কিন্তু লোকটা কে, নিতে না এলে জানব কীভাবে?' রবিন বলল। 'দ্বীপের এদিকটাতে অনেকেই আসে, বোঝাই তো যাচ্ছে।'

'এক কাজ করা যেতে পারে', কিশোর জবাব দিল। 'শিশিটা নিয়ে গিয়ে শুধু ব্যাগটা ফেলে যাই।'

'ভালো বুদ্ধি!' বাদামি ব্যাগটা আবার আগের জায়গায় রেখে দিল রবিন। 'আমি নেমে গিয়ে কাছেই কোথাও বসে থাকি। দেখি, কে আসে। তুমি শিশিটা নিয়ে শেরিফের কাছে যাও।'

'ঠিক আছে।' শিশিটা পকেটে ভরল কিশোর। রবিনকে ওখানে রেখে সৈকতের পাথর মাড়িয়ে এগিয়ে চলল। রাস্তায় উঠে ধূসর-সাদা রং করা নিঃসঙ্গ বাড়িটার পাশ দিয়ে চলল, ফেরি থেকে যেটা দেখেছিল। বাড়িটা সাগর থেকে কয়েক শ ফুট দূরে। মনে পড়ল ওর, ক্যানি বলেছিলেন, বাড়িটা বিখ্যাত শিল্পী কলি জেসনের।

দোতলায় একটা খোলা ব্যালকনি আছে। সেখানে দুরবিন হাতে দাঁড়ানো একজন মহিলা, বাতাসে খোলা সাদা চুল উড়ছে, তাঁর পরনে গোলাপি রঙের একটা কাফতান। শিল্পীজগতের একজন সুপারস্টার, পত্রিকায় তাঁর ডজন ডজন ছবি দেখেছে কিশোর।

ভাবল, কতক্ষণ ধরে ওখানে দাঁড়িয়ে আছেন তিনি? ব্যালকনি থেকে কি জাহাজের ধ্বংসাবশেষটা দেখা যায়? মনে হয়, যায়। রবিন যে স্যালমোনেলার শিশিটা পেয়েছে, সেটা কি তিনি দেখেছেন? দ্রুত সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল কিশোর। রাস্তা থেকে ঘুরে এগিয়ে গেল বাড়িটার সামনের দরজার দিকে।

বেশি দূর এগোতে পারল না। কানে এল কুকুরের ভারি ডাক আর চাপা গর্জন। চোখের পলকে বেরিয়ে এল দুটো কালো রঙের ভয়ংকর ডোবারম্যান পিনশার কুকুর, চোখে খুনের নেশা। লাফাতে লাফাতে সোজা ছুটে এল কিশোরের দিকে। নিজেকে শান্ত রাখার চেষ্টা করল ও, একই সঙ্গে ঘুরে গিয়ে রাস্তায় চলে এল আবার।

ভাগ্য ভালো, বাড়ির সীমানার কিনারায় এসে দাঁড়িয়ে গেল কুকুর দুটো। তবে ঘেউ ঘেউ ডাক থামাল না। নিরাপদ দূরত্বে এসে ফিরে তাকাল কিশোর, ব্যালকনির দিকে। দুরবিনের চোখ এখন তার দিকে ঘুরে গেছে। কিশোরের মনে হলো, মহিলা হাসছে।

জেদ চেপে গেল কিশোরের। সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল ও। কুকুর থাক বা না থাক, খুব শিগগির মহিলার সঙ্গে দেখা করবে ও। ঘুরে দাঁড়িয়ে রাস্তা ধরে শহরের দিকে হেঁটে চলল। ঠিক এ সময় উল্টোদিক থেকে বুস্টার মরিসনকে আসতে দেখল। আপনমনে শিস দিতে দিতে হাঁটছে, দুনিয়ার কোনো দিকেই যেন নজর নেই। ওর হাতে ভাঁজ করা একটা সবুজ প্লাস্টিকের ব্যাগ, একটা পকেট উঁচু হয়ে ফুলে রয়েছে, মনে হলো কৌটার মতো কিছু রয়েছে।

'হাই, বুস্টার,' ডাক দিল কিশোর, চমকে দিল লোকটাকে। থমকে দাঁড়িয়ে সন্দিহান চোখে কিশোরের দিকে তাকাল বুস্টার। 'ওবাড়ির ওই কুত্তাগুলো মোটেও সুবিধের নয়, তাই না?' গোমড়ামুখো লোকটার সঙ্গে আলাপ করার ভঙ্গিতে বলল কিশোর।

'হ্যাঁ', লোকটা বলল। 'ওগুলোকে খুন করার ট্রেনিং দিয়েছে মহিলা। অনেককে কামড়াতে দেখেছি আমি।'

'এইমাত্র শিপরেক থেকে এলাম', বলে, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে বুস্টারের দিকে তাকিয়ে ওর প্রতিক্রিয়া দেখতে চাইল কিশোর। 'দারুণ।'

'হ্যাঁ', নির্বিকার ভঙ্গিতে আবার বলল বুস্টার।

'আপনি নিশ্চয় কোনো দিন জাহাজটাতে ওঠেননি', কিশোর বলল, 'যেহেতু দ্বীপেই বাস করেন। কথায় আছে না, বেশির ভাগ নিউ ইয়র্কবাসীই নিউ ইয়র্কের দর্শনীয় বস্তু স্ট্যাচু অব লিবার্টি দেখেনি।'

'আমি ওই জাহাজটাতেই যাচ্ছি', বুস্টার বলল। 'তোমরা ট্যুরিস্টরা সব জায়গায় জঞ্জাল ফেলে নোংরা করো, কাউকে না কাউকে তো সেগুলো সাফ করতে হবে।' কিশোরের দিকে বিরক্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে, তাড়াহুড়ো করে পাথুরে রাস্তাটা দিয়ে চলে গেল সে।

বুস্টারের দিকে তাকিয়ে ভাবতে লাগল কিশোর, ওর হাতের প্লাস্টিকের ব্যাগটা কি জাহাজে রাখা ব্যাগটা লুকানোর জন্য? রবিন ওখানে অপেক্ষা করছে। বুস্টার কী করে সবই দেখতে পাবে।

পনেরো মিনিট হাঁটার পর শহরের প্রান্তে শেরিফ বাক উইনারের বাড়িতে পৌঁছাল কিশোর। বাইরের আঙিনায় বসে থাকতে দেখল শেরিফকে, সামনে একটা টেবিল পেতে মাছ ধরার জাল মেরামত করছেন।

বাকের কাছে গিয়ে কিশোর বলল, 'আমি আর রবিন একটা জিনিস খুঁজে পেয়েছি, মনে হয় আপনার দেখা দরকার, শেরিফ।'

'ও', জাল থেকে মুখ তুলে তাকালেন শেরিফ। 'কী পেয়েছ?'

পকেট থেকে শিশিটা বের করে দিল কিশোর। রবিন এটা কোথায় কীভাবে পেয়েছে, জানাল।

সাবধানে শিশিটা পরীক্ষা করে দেখলেন শেরিফ। কোনো ভাবান্তর হলো না চেহারায়। 'দুজন লোকের পিছু নিয়েছিলে বললে। কেন?'

'ওরা অদ্ভুত আচরণ করছিল', কিশোর জানাল। 'ওদের দিকে শুধু হাত নেড়েছিলাম। আমাদের দেখামাত্র জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে তাড়াতাড়ি হাঁটতে শুরু করল, যা করতে চেয়েছিল সেটা আমাদের দেখতে দিতে চায়নি। তাতে সন্দেহ জাগে আমাদের। তাই পিছু নিয়েছিলাম। শিপরেকের কাছে গিয়ে ওদের হারিয়ে ফেললাম। ডোবা জাহাজটায় উঠলাম আমি আর রবিন। ওখানেই একটা কাগজের ব্যাগের মধ্যে পেয়েছি শিশিটা।'

'কেউ ওটা ওখানে রেখে এসেছে অন্য কারও তুলে নেওয়ার জন্য', ধীরে ধীরে বললেন শেরিফ।

'হ্যাঁ', কিশোর বলল। 'ওই দুজন লোক হতে পারে, কিংবা অন্য কেউ। সেজন্যই রবিনকে ওখানে রেখে এসেছি, ব্যাগটা কে নিতে আসে দেখার জন্য।'

মাথা ঝাঁকালেন শেরিফ। হাসলেন। 'আমি যতটা ভেবেছিলাম, তারচেয়ে চালাক তোমরা। কাজ চালিয়ে যাও।'

'আরেকটা কথা', কিশোর বলল। 'আমার ধারণা, মিস কলি জেসন সব ঘটনাই দেখেছেন। ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে দুরবিন দিয়ে দেখছিলেন। শিশিটা কে রেখে এসেছে, নিশ্চয় দেখেছেন তিনি। আমি তাঁর সঙ্গে কথা বলতে চেয়েছিলাম, কিন্তু তাঁর কুত্তা দুটো আমাকে তাড়া করল, কোনোমতে পালিয়ে এসেছি।'

'হ্যাঁ, ও দুটোকে ট্যুরিস্ট তাড়ানোর জন্যই রেখেছে', বাক বললেন। 'একা থাকতে পছন্দ করে মিস কলি, তবুও ট্যুরিস্টরা বিরক্ত করে মারে।'

'আমার মনে হয়, তাঁর সঙ্গে কথা বলা দরকার', কিশোর বলল।

'ঠিক আছে, বলব', বাক বললেন। বিষের শিশিটা নিজের শার্টের পকেটে ঢোকালেন। তাতে চাপড় দিয়ে বললেন, 'নিরাপদ জায়গায় রেখে দেব এটা।'

'ও, আপনার বোটের কী অবস্থা?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'ঠিক হয়ে যাবে, ইঞ্জিনটা শুকালেই', শেরিফ বললেন। 'ফুটোটা আপাতত মেরামত করেছি। বেশি চাপে না ফেললে, কিংবা ঝড়ের মধ্যে বের না করলে টিকে যাবে।'

'আরেকটা কথা', কিশোর বলল, 'মিস্টার হ্যারির চিংড়ির ফাঁদটা খুঁজে পেয়েছি আমরা। টুকরো টুকরো করে কেটে মিস্টার গিলবার্টের ফায়ারপ্লেসের জ্বালানি কাঠের সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছে। আর সরাইখানায় ওই কাঠ সাপ্লাই দিয়েছে বুস্টার মরিসন।'

'তাতে প্রমাণ হয় না বুস্টারই ফাঁদটা চুরি করেছে', বাক বললেন। 'যে কেউ ফাঁদটা কেটে জ্বালানি কাঠের সঙ্গে মিশিয়ে দিতে পারে। এমনকি মিস্টার অ্যারন গিলবার্টও। তুমি তাকে চেন না।' মুখ গম্ভীর করে শেরিফ বললেন, 'যেকোনো ধরনের খারাপ কাজ করতে পারে ও, আমি তোমাকে বলেছি।'

'হয়তো পারেন', কিশোর বলল। 'কিন্তু এইমাত্র বুস্টারের সঙ্গে দেখা হয়েছে আমার। তাড়াহুড়ো করে শিপরেকের দিকে যাচ্ছে।'

মুখ তুলে কিশোরের দিকে তাকালেন বাক। 'শোনো, আমি শেরিফ। প্রমাণ ছাড়া শুধু সন্দেহের বশে কাউকে অভিযুক্ত করতে পারি না। বুস্টার যখন ছোট ছিল, তখন থেকেই আমি ওকে চিনি। ওর নিজেরও কিছু সমস্যা আছে। তবে যেকোনো মানুষের নতুন করে জীবন শুরু করার অধিকার আছে। যদি সত্যিই প্রমাণ পাই, ও অপরাধী, ওকে আমি নিশ্চয়ই অ্যারেস্ট করব। তার আগে, আমি কিছুই করতে পারব না। আমাকে আমার মতো করে কাজ করতে দাও। ক্যানারিতে বেড়াতে এসেছ তোমরা, সেটাই করো, আনন্দ করার দিকে মনোযোগ দাও। ঠিক আছে?'

আর কিছু না বলে জালের দিকে মনোযোগ দিলেন শেরিফ। কয়েকটা সেকেন্ড যেন বোকা হয়ে দাঁড়িয়ে রইল কিশোর, বিব্রত বোধ করছে। তারপর শুকনো কণ্ঠে, 'ঠিক আছে যাই, দেখা হবে', বলে সরে এল ওখান থেকে। রাস্তায় এসে হাঁটতে লাগল। শেরিফের এই অসহযোগিতার মনোভাব অবাক করেছে ওকে। দ্বীপের সমস্যাগুলো নিয়ে যদি উদ্বিগ্নই থাকেন শেরিফ, তাহলে সেটা তার মধ্যে প্রকাশ পাচ্ছে না, তারচেয়ে বাড়ির আঙিনায় বসে জাল মেরামত করতেই বেশি মনোযোগী তিনি।

ঘড়ির দিকে তাকাল কিশোর। বারোটা বেজে গেছে। মুসা নিশ্চয় কফি শপে অপেক্ষা করছে। রাস্তা দিয়ে দ্রুত হাঁটতে হাঁটতে একবার শেরিফের বাড়ির দিকে ফিরে তাকাল কিশোর।

আর যা দেখল, তাতে থমকে দাঁড়িয়ে গেল। শেরিফের বাড়ির পেছনে ঝোপের তের থেকে দৌড়ে বেরিয়ে এল বুস্টার। তবে কি কিশোরের পিছু নিয়ে শেরিফের বাড়িতে ঢুকেছিল ও, ওরা কী কথা বলে শোনার জন্য? শেরিফের সঙ্গে কিশোর যা যা বলেছে, বুস্টার সব শুনেছে, কোনো সন্দেহ নেই।

চিন্তিত ভঙ্গিতে দ্রুত শহরের দিকে হাঁটতে লাগল কিশোর। বুস্টারের রহস্যময় আচরণের ব্যাপারে খোঁজ নিতেই হবে। লোকটা সম্পর্কে শেরিফের মুখ না খোলার নিশ্চয় কোনো কারণ রয়েছে।

কফি শপে ঢুকল কিশোর।

'কিশোর, এদিকে!' ঘরের পেছনের প্রান্ত থেকে ডাকল মুসা। মস্ত একটা স্যান্ডউইচ খাচ্ছে।

'ওয়েট্রেসকে আরও দুটো স্যান্ডউইচ বানিয়ে দিতে বলো', মুসাকে বলল কিশোর। 'একটা আমার, একটা রবিনের জন্য।'

ওয়েট্রেস স্যান্ডউইচ বানাচ্ছে আর এই সময় মুসাকে সকালবেলা যা যা ঘটেছে সব জানাল কিশোর। স্যান্ডউইচ বানানো শেষ হলে দাম মিটিয়ে দিল। একটা প্লেটে রেখে দিয়ে মুসাকে বলল, 'এটা রবিন এলে তাকে দিয়ো। খাওয়ার পর শিপরেকে চলে যেয়ো। আমি যত তাড়াতাড়ি পারি তোমাদের সঙ্গে ওখানে দেখা করব।'

'তুমি কোথায় যাচ্ছ?' অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল মুসা।

'গ্যালারিতে', কিশোর বলল। 'কলি জেসনের ছবি সম্পর্কে সামান্য খোঁজখবর নিয়ে আসি। এ দ্বীপের সবচেয়ে বড় আকর্ষণ তিনি। গ্যালারিতে গেলে হয়তো কোনো সূত্রও পেতে পারি।'

তাড়াহুড়ো করে স্যান্ডউইচটা খেয়ে বেরিয়ে এল কিশোর। রাস্তা পেরিয়ে ওপাশের উজ্জ্বল গোলাপি অলংকরণ করা সাদা রঙের বাড়িটার দিকে এগোল। গ্যালারির সামনের ঘরে ঢুকতেই লাল চুলওয়ালা সেই মহিলার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল, সেদিন যাকে সিঁড়ি ঝাড়ু দিতে. দেখেছিল। ডেস্কের ওপাশে বসে আছেন। পত্রিকা পড়ছেন। মুখ তুলে তাকালেন। বয়স আঠাশ-উনত্রিশ হবে, অনুমান করল কিশোর।

'হ্যালো', মহিলা বললেন। 'কী সাহায্য করতে পারি?'

'আমি এলাম', কিশোর বলল, 'আপনার কাছে কলি জেসনের কোনো ছবি আছে কি না জানতে। যদিও, ওসব নীচ ছবি কেনার সামর্থ্য আমার নেই।'

'তার মানে তুমি দেখে আনন্দ পেতে এসেছ', হাসিমুখে মহিলা বললেন। 'ঠিক আছে, কোনো অসুবিধে নেই। আমি ডিনা মুলার্ট, এই গ্যালারির মালিক। যারা ছবি দেখতে আসে, না কিনলেও তাদের আমি পছন্দ করি। সব সময় আসে ওরা।'

কথার মৃদু ইয়োরোপিয়ান টান, ফরাসিদের মতো করে বাঁধা মোটা বেণি, চীনা-স্টাইলের সিল্কের জ্যাকেটে বেশ অভিজাত লাগছে মহিলাকে। তবে সবচেয়ে ভালো লাগল তাঁর আন্তরিকতা আর খোলামেলা কথাবার্তা। তাঁর সঙ্গে কথা বলা সহজ হবে, ভাবল কিশোর।

'আমি কিশোর পাশা', পরিচয় দিল কিশোর।

'তুমি খুব ভাগ্যবান, কিশোর', ডিনা বললেন। 'কাল রাতেই কলির চারটে ছবি এসেছে, তেলরং। পেছনের ঘরে আছে ওগুলো। ঝোলাতে পারিনি, তার কারণ আজ আমার অ্যাসিসট্যান্ট আসেনি।'

'ছবিগুলো দেখতে পারলেই খুশি, ঝোলানো হোক বা না হোক। আমি কলির মস্ত ভক্ত', কিশোর বলল।

'এ রকম অনেক ভক্তই আছে', মৃদু হেসে জবাব দিলেন ডিনা। 'রং না দিয়ে যদি শুধু স্কেচ করে করে দেয় কলি, তা-ও বিক্রি করতে পারব। আর তাঁর রং ব্যবহারের তো তুলনা হয় না। দেখলেই ভালো লাগে।'

'তাঁর সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে পরিচয় আছে আপনার?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'আছে, বহু বছর ধরে', ডিনা বললেন। 'সত্যি কথা বলতে কি, কলির ছবি যারা প্রথম বিক্রি করা শুরু করেছিল, আমার বাবা তাদের একজন। এই গ্যালারি থেকেই বিক্রি করেছিল বাবা। এখন বাবা অবসর নিয়েছে।'

'আজ সকালে একটা ঘটনা ঘটেছে', কিশোর বলল। 'কলির একটা অটোগ্রাফ নেওয়ার জন্য তাঁর বাড়িতে ঢুকেছিলাম। কিন্তু দুর্ভাগ্য আমার, তাঁর কুকুরগুলোর জন্য পারিনি।'

কেঁপে উঠলেন ডিনা। 'ও, ওই দুটো! ডোবার আর ফেবার। ভয়ংকর প্রাণী, তাই না?'

'তাতে কোনো সন্দেহ নেই', স্বীকার করল কিশোর।

'বেঁচে যে ফিরতে পেরেছ, এ জন্য ভাগ্যকে ধন্যবাদ

নাও', হেসে বলল ডিনা। 'এসো, পেছনের ঘরে, ছবিগুলো দেখাই।'

মহিলাকে অনুসরণ করে পেছনের একটা ছোট ঘরে এল কিশোর। প্রচুর হাতে আঁকা আর ক্যামেরায় তোলা প্রিন্ট করা ছবির স্তূপ ওখানে। ঘরের অন্য প্রান্তের দেয়ালে আরেকটা দরজা। সেটা দিয়ে কিশোরকে নিয়ে একটা রেস্টরুমে ঢুকলেন ডিনা। এখানেও ছবির স্তূপ। একটা স্তূপে খুঁজতে লাগলেন, একবার, দুবার, তিনবার। চেহারায় উদ্বেগ ফুটেছে। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে যখন কিশোরের দিকে ঘুরলেন, চোখে স্পষ্ট আতঙ্ক দেখতে পেল কিশোর। কম্পিত কণ্ঠে ডিনা বললেন, 'ছবিগুলো নেই!'

'আপনি শিওর?' কিশোর জিজ্ঞেস করল।

'হ্যাঁ, আমি শিওর। এখানেই রেখেছিলাম ছবিগুলো। সকালেও ছিল।'

'তার মানে এর একটাই জবাব', মহিলার দিকে তাকিয়ে আছে কিশোর।

'হ্যাঁ', মাথা ঝাঁকাল মহিলা, 'কলির নতুন ছবিগুলো চুরি হয়ে গেছে!'

ছয়

'ঘাবড়াবেন না, প্লিজ', বিহ্বল হয়ে যাওয়া মহিলাকে অভয় দিয়ে বলল কিশোর। 'ছবিগুলো অন্য কোথাও সরিয়ে রাখেননি তো?'

'না, এখানেই রেখেছিলাম', ডিনা বললেন। 'কলি নিজে এসে ছবিগুলো আমাকে দিয়ে গেছে। ওখানেই রেখেছিলাম, পরে ঝোলাব ভেবে।'

গ্যালারির পেছনের দরজাটার কাছে এসে দাঁড়াল কিশোর। তালার দিকে তাকাল। 'এই একটা তালাই লাগানো থাকে?' তালাটা পরীক্ষা করে দেখল ও।

'হ্যাঁ', ডিনা জবাব দিলেন। 'এখানে কোনো দিন চুরি হয় না তো, বাবা গ্যালারিটা চালু করার পর থেকে তার আমল, আমার আমল, কখনো একটা চুরির ঘটনাও ঘটেনি। সততার জন্য সুনাম আছে ক্যানারি আইল্যান্ডের মানুষের।'

'আপনি বললেন, আজ সকালেও ছবিগুলো দেখেছেন, তার মানে দিনের কোনো একসময় চুরি হয়েছে', কিশোর বলল।

'হ্যাঁ। কিন্তু তা কী করে সম্ভব?' বিশ্বাস করতে পারছেন না ডিনা। 'সারাটা সময় আমি এখানে ছিলাম।'

'আমরা আপনাকে সামনের সিঁড়ি ঝাড়ু দিতে দেখেছি।'

'হ্যাঁ, রোজই দিই।'

'আজ সকালে কে কে এসেছিল দোকানে?' জানতে চাইল কিশোর। 'মনে করতে পারবেন?'

অসহায় ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকালেন মহিলা। 'আসলে, আমি খেয়ালই করিনি। আর যেহেতু পেছনের ঘরে ছবি রাখি, লোকে সেখানে ঢোকেই। ওখানে গিয়ে কে কী করে, তা তো জানি না, নজর রাখার প্রয়োজনও মনে করি না।'

'ভাবুন, ডিনা। আজ সকালের পর কে কে ঢুকেছে মনে করার চেষ্টা করুন। চেষ্টা করলেই পারবেন।'

'ইয়ে, একজন মহিলা আর একটা লোক, এশিয়ান, সম্ভবত স্বামী-স্ত্রী। ওরা একটা ছবি কিনেছে। মিরা বার্নারের বানানো একটা কাঠের মূর্তির ফটোগ্রাফ।' ভারী দম নিয়ে আবার ভাবতে লাগলেন ডিনা। মনে করার চেষ্টা করছেন। 'বাক এসেছিল দেখা করতে। কিছুক্ষণ কথা বলেছি। একবার অবশ্য রেস্টরুমটা ব্যবহার করতে পেছনের ঘরে গিয়েছিল। এখনই তার সঙ্গে দেখা করা দরকার, চুরির খবরটা জানাতে, তাই না?' আবার ভাবতে লাগলেন তিনি। ঠোঁটে ঠোঁট চেপে বসল। 'হ্যাঁ, পলি বার্জেন এসেছিল লাঞ্চের একটু আগে। ওকে তো চেন?'

'চিনি', জবাব দিল কিশোর। 'বুস্টার মরিসন এসেছিল? এখানে ঢুকেছিল?'

প্রশ্নটা হতবাক করে দিল যেন মহিলাকে। 'বুস্টার তো রোজই আসে এখানে। আমার আবর্জনা ফেলে দিয়ে আসার জন্য ওকে আমি টাকা দিই।'

'আর নিশ্চয় এ ঘরেও ঢোকে, আপনার ময়লা ফেলার বালতিটা তো এখানেই দেখতে পাচ্ছি', পরিষ্কার একটা সাদা রঙের বড় বালতির দিকে তাকিয়ে বলল কিশোর।

'হ্যাঁ', ডিনা বললেন।

'আঠাশ-উনত্রিশ বছর বয়সী দুজন লোক, ট্যুরিস্ট, তারা কি এসেছিল? একজনের চোখে চশমা?'

'মনে করতে পারছি না। পত্রিকা পড়ছিলাম। পড়ার ফাঁকেই যারা যারা এসেছে, তাদের সঙ্গে কথা বলেছি। মানুষকে বিশ্বাস করায় অভ্যস্ত হয়ে গেছি, সাবধান থাকার কথা মাথায় ছিল না', বিষণ্ন কণ্ঠে বললেন ডিনা।

মহিলার মনের অবস্থা বুঝতে পারল কিশোর। ক্যানারি আইল্যান্ডের মতো একটা সুন্দর দ্বীপে নানা রকম অপরাধের ঘটনা ঘটছে, ব্যাপারটা দুঃখজনক। জিজ্ঞেস করল, 'ছবিগুলোর দাম কত হবে?'

'কয়েক হাজার ডলার', ডিনা বললেন। 'কিন্তু টাকাটা বড় কথা নয়। আমার গ্যালারি থেকে ছবি চুরি হয়েছে শুনলে আর্টিস্টরা কেউ আর আমার কাছে তাদের জিনিস বিক্রি করতে দেবে না। ব্যবসা বন্ধ হয়ে যাবে আমার।'

'তারচেয়েও খারাপ ঘটনা ঘটতে পারে', কিশোর বলল। 'ক্যানারি দ্বীপে আর্ট একটা বড় ব্যবসা, তাই না?'

'হ্যাঁ', মাথা ঝাঁকালেন ডিনা। 'ট্যুরিস্টদের একটা বড় অংশ এখানে আসে আর্টিস্টদের বাড়িঘর দেখতে, তাদের সঙ্গে পরিচিত হতে, তাদের আঁকা ছবি কিনতে।'

'ব্যবসা বন্ধ হয়ে গেলে আর্টিস্টরা চলে যাবে, ট্যুরিস্ট আসবে না।'

'হায় হায়, এসব তো ভাবিনি', ডিনা বললেন। 'তবে কি কেউ ট্যুরিস্ট ব্যবসাটা বন্ধ করতে চাইছে?'

'সেটা বলতে পারব যদি কে ছবি চুরি করেছে আর অন্য অপরাধগুলো ঘটাচ্ছে, সেটা জানতে পারি', জবাব দিল কিশোর। 'এসব অপরাধের উদ্দেশ্যও বোঝা যাবে। কোনখান থেকে তদন্ত শুরু করব, আপনি কোনো ধারণা দিতে পারেন?'

হঠাৎ উজ্জ্বল হয়ে উঠল ডিনার মুখ। 'না, তবে একটা কথা ভাবছি। কাল সকালের আগে সি স্টার আসবে না। ততক্ষণ এই দ্বীপেই থাকবে ছবিগুলো। তার মানে চেষ্টা করলে এখনো সেগুলো উদ্ধার করা যায়।'

'ঠিক কথাই ভেবেছেন', কিশোর বলল।

হাসিটা হঠাৎ করেই আবার মুছে গেল মহিলার মুখ থেকে। 'কিন্তু, কলিকে কথাটা জানাতে হবে। শুনে রেগে যাবে, জানি আমি। ওকে তো চিনি, হয়তো আমাকেই দোষ দেওয়া শুরু করবে।'

'তা কেন দেবেন?' কিশোর বলল, 'সেটা তো ঠিক না।'

'বড় শিল্পীরা অনেক সময় ঠিক-বেঠিক বুঝতে চায় না,' ডিনা বললেন। 'বেশি আবেগপ্রবণ হয়। কোনো কিছু যুক্তি দিয়ে বিচার করতে চায় না।'

'আমি কি যাব আপনার সঙ্গে?'

'যাবে? তাহলে তো খুব ভালোই হয়', ডিনা বললেন। স্বস্তি বোধ করছেন। 'কলি রেগে গেলে ভয়ংকর হয়ে ওঠে।'

দোকানে তালা দিয়ে কিশোরকে নিয়ে রওনা হলেন ডিনা। রাস্তা দিয়ে হেঁটে বিশ মিনিটের মধ্যে পৌঁছে গেলেন কলির বাড়িতে।

'কলি!' ডাক দিলেন ডিনা। 'আমি! ডিনা!'

দরজায় বেরিয়ে এলেন কলি। গলায় ঝোলানো দুরবিন। বারান্দা থেকে নেমে হেঁটে এলেন ওদের দিকে।

ভয়ে ভয়ে বললেন ডিনা, 'বড় একটা দুঃসংবাদ আছে, কলি। কাল রাতে যে ছবিগুলো গ্যালারিতে দিয়ে এসেছিলেন, সেগুলো চুরি হয়ে গেছে।'

কলি জেসনের বড় বড় বাদামি চোখজোড়া চওড়া হয়ে গেল। 'কী হয়েছে?'

সব কথা যতটা সম্ভব বুঝিয়ে বললেন ডিনা। মনোযোগ দিয়ে শুনলেন কলি। সবশেষে ডিনা বললেন, 'আমি জানি, আপনি রাগ করবেন। কিন্তু আমারও খুব খারাপ লাগছে।'

'ছবিগুলো কি বিমা করানো ছিল?' জানতে চাইল কিশোর।

'তুমি কে?' ঝট করে কিশোরের দিকে তাকালেন কলি। রুক্ষকণ্ঠে বললেন, 'এখানে কী?'

'ওর নাম কিশোর পাশা, কলি', ডিনা বললেন। 'ছবিগুলো চুরি গেছে এটা আমি যখন জানলাম, ও তখন ওখানে ছিল। আমাকে সহানুভূতি জানাল। খুবই ভালো ছেলে।'

কিশোরের দিকে তাকিয়ে রইলেন শিল্পী। যেন ছেলেটা আসলেই ভালো কি না বোঝার চেষ্টা করছেন। মনে হলো অপছন্দ করেননি, কারণ আবার যখন কথা বললেন, গলার রুক্ষতা কেটে গেল, 'কিন্তু আমি এখন কী করব? ক্যানারিতে এসেইছিলাম শান্তির জন্য। সারা দুনিয়া থেকে পালাতে চেয়েছিলাম। কিন্তু এখন তো দেখছি, স্বর্গ বলে কোনো কিছু পৃথিবীতে নেই। এই দ্বীপে অন্তত শান্তি আশা করেছিলাম। শান্তি ছাড়া আমি কাজ করতে পারি না।'

'মিস জেসন', কিশোর বলল, 'আমি আর আমার দুই বন্ধু মিলে এই দ্বীপের সমস্যাগুলো সমাধানের চেষ্টা করছি। খানিক আগে, আমি আর আমার বন্ধু যখন ডোবা জাহাজটায় একটা জিনিস খুঁজে পেয়েছি, আপনি তখন ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে ছিলেন। আমি আপনাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছি। আমাদের আগে কি দুজন লোককে জাহাজটায় উঠতে দেখেছেন?'

'হ্যাঁ, দেখেছি। আমি মনে করেছি ওরা ফটোগ্রাফার। কারণ, ওদের সঙ্গে ট্রাইপড ছিল। একজন সৈকতে দাঁড়িয়েছিল, আরেকজন পানি ভেঙে গিয়ে জাহাজটায় উঠেছিল। তুমি আর বাদামি চুলওয়ালা ছেলেটা আসার সামান্য আগেই ঘটেছিল ঘটনাটা', কলি জানালেন।

'ও-ই আমার বন্ধু, রবিন', কিশোর বলল।

'তবে ঘটনাটায় অস্বাভাবিক কিছু দেখিনি আমি', কলি বললেন। 'অনেক ট্যুরিস্টই ওই জাহাজে গিয়ে ওঠে। যদিও সাবধান করে রাখা হয়েছে। কিন্তু বেশির ভাগই শোনে না।'

'আপনি অনেক বড় একটা সাহায্য করলেন', কিশোর বলল। ও যা সন্দেহ করেছিল—সি স্টারে করে আসা ওই লোক দুজনের সঙ্গে ভাঙা জাহাজে পাওয়া স্যালমোনেলার শিশির কোনো সম্পর্ক আছে—সেটাই ঠিক মনে হচ্ছে এখন। ডিনার দিকে ফিরে বলল, 'আমি

যাই, রবিনের সঙ্গে কথা বলতে হবে। পরে আপনার সঙ্গে দেখা করব।' দুজনকে গুডবাই জানিয়ে শিপরেকের দিকে চলল ও। ওখানে পৌঁছে সৈকতে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল মুসা ও রবিনকে। অল্প পানিতে দাঁড়ানো, যেখানে বারবার পাথরগুলোকে ধুয়ে দিয়ে যাচ্ছে সাদা ফেনায় ভরা সাগরের ঢেউ।

'এতক্ষণে এলে!' কিশোরকে দেখেই বলে উঠল রবিন। 'ছিলে কোথায়? ব্যাগটার কাছে কেউ আসেনি।'

'বুস্টারও না?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'বুস্টার?' কিশোরের কথার প্রতিধ্বনি করল যেন রবিন। 'না, আসেনি।'

শেরিফের বাড়ির পেছনের ঝোপ দিয়ে বুস্টারের দৌড়ে যাওয়ার দৃশ্যটা মনে পড়ল কিশোরের। বলল, 'এমন কিছুই আশা করছিলাম আমি। ব্যাগটা যার নিতে আসার কথা, সে তোমাদের দেখে চুপচাপ সরে পড়েনি তো?'

'ফালতু কথা বোলো না!' রেগে উঠল মুসা। 'আমাদেরকে কি এতই হাঁদা মনে করেছ? আমরা এখানে খোলা জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকিনি। ওই যে ওই গাছগুলো, ওগুলোর আড়ালে লুকিয়ে বসে ছিলাম গত একটি ঘণ্টা।'

'মাত্র দশ মিনিট আগে বেরিয়ে এসেছি', মুসার কথার সঙ্গে যোগ করল রবিন।

'হুঁ', চিন্তিত ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল কিশোর। 'আর এখানে অপেক্ষা করে লাভ নেই, এখন আর কেউ আসবে বলে মনে হয় না। চলো, বাড়ি যাই।'

সেদিন সন্ধ্যায় দুই বন্ধুকে নিয়ে ডিনার খেতে সরাইখানায় চলল কিশোর। একটা টেবিলে বসল, এ সময় ওখান দিয়ে যেতে যেতে থেমে গেলেন মিস্টার গিলবার্ট। 'হ্যারি একটা আট ফুট লম্বা হ্যালিবাট মাছ ধরেছে আজ', হাসিমুখে জানালেন তিনি। 'আজ রাতে সেটা দিয়েই ভোজ হবে।'

'নিরামিষ ভালো লাগে আমার', টনি অর্ডার নিতে এলে তাকে বলল মুসা। 'কিন্তু আট ফুট লম্বা একটা হ্যালিবাটের কথা শুনে লোভ সামলাতে পারছি না।'

'আমিও না', কিশোর বলল।

'মাছ আমার ভালো লাগে না', রবিন বলল। 'আমি আজ নিরামিষ খাব।'

এই সময় সেই দুজন লোক, যারা শিপরেকে ওদেরকে দেখে দৌড়ে পালিয়েছিল, তারা দেখা দিল ডাইনিংরুমের দরজায়।

'হঠাৎ করেই আন্তরিক হয়ে উঠতে ইচ্ছে করছে আমার', লোকগুলোর দিকে তাকিয়ে রবিন বলল। 'ওদেরকে আমাদের টেবিলে বসতে বলি?'

'বলো', উৎসাহিত হয়ে বলল কিশোর। 'মুসা, তুমি ওদের আটকে রাখার চেষ্টা কোরো। পারবে তো?'

একটা সেকেন্ডের জন্য দ্বিধান্বিত মনে হলো মুসাকে। তারপর মাথা ঝাঁকাল। 'পারব। তুমি আসলে চাইছ, আমি ওদের আটকে রাখি, যাতে তুমি আর রবিন গিয়ে ওদের ঘরে খুঁজতে পারো...'

'আস্তে!' থামিয়ে দিল ওকে কিশোর।

উঠে দাঁড়াল রবিন। সোজা এগিয়ে গেল লোকগুলোর কাছে।

'হাই! চিনতে পারছেন? ফেরিতে আমরা একসঙ্গে এসেছি। আমি রবিন মিলফোর্ড', দুজনের সঙ্গেই জোর

করে হাত মেলাল ও। সন্দিহান চোখে রবিনের দিকে তাকিয়ে আছে দুজনে। কিন্তু দেখেও দেখল না ও। বলল, 'ওই যে টেবিলটায় বসে আছে, ওরা আমার বন্ধু, একজনের নাম কিশোর পাশা আরেকজন মুসা আমান। আসুন না, আমাদের সঙ্গে বসেই খান। অনেক জায়গা আছে।'

অস্বস্তিভরে পরস্পরের দিকে তাকাতে লাগল দুজনে, কিন্তু রবিন ছাড়ল না, না বলার কোনো সুযোগই দিল না ওদেরকে। 'নাম কী আপনাদের?' লোকগুলোকে টেবিলের দিকে প্রায় ঠেলে নিয়ে চলল ও।

'আমি রিক বেরিং', বালি রং চুলওয়ালা পাতলা দড়ির মতো পাকানো দেহের লোকটা জানাল। ওর গাল আর ঘাড়ে একটা রোদেপোড়া দাগ লক্ষ করল রবিন।

'রিগার জোনস', বলল ঘন কালো চুল, পেশিবহুল ভারী শরীর আর বাদামি চোখওয়ালা চশমাপরা দ্বিতীয় লোকটা।

টেবিলের কাছে এসে বন্ধুদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল রবিন, 'ইনি রিক, ইনি রিগার।' দুই বন্ধুকে দেখিয়ে অতিথিদের বলল, 'ও কিশোর, আর ও মুসা।' একটু থেমে জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা, ক্যানারি আইল্যান্ডে কি বেড়াতে এসেছেন?'

একটা মুহূর্তের অস্বস্তিকর নীরবতা, আবার পরস্পরের দিকে তাকাচ্ছে লোকগুলো, যেটা ঠিক স্বাভাবিক মনে হলো না রবিনের কাছে। 'আসলে আউটডোর...' অবশেষে রিগার বলল, 'মানে, শহরের বাইরে কোথাও বেড়ানো...মাছধরা, শিকার করা, এই সব আরকি।'

'হ্যাঁ, তা ঠিক', সুর মেলাল রিক।

'তো রিক, রিগার, আপনারা কী খাবেন?' আঙুলের ইশারায় টনিকে ডাকল কিশোর।

'তোমাদের কাছে নিশ্চয় লন্ডন ব্রয়েল নেই, নাকি?' রিক জিজ্ঞেস করল। মাথা নাড়ল ওয়েটার। আবার জিজ্ঞেস করল রিক, 'প্রাইম রিব? ল্যাম্ব চপ?'

'শুধু হ্যালিবাট মাছ আর নিরামিষ', টনি জানাল। 'এখানে আমাদের এত বাবুর্চি নেই যে এত কিছু রান্না করবে।'

'তাহলে নিরামিষই দাও', রিগার বলল। 'খেতে নিশ্চয় খারাপ লাগবে না।'

'আমাকেও নিরামিষ দাও', টনিকে বলল রিক।

'এই টেবিলের জন্য তাহলে তিনটে নিরামিষ আর দুটো হ্যালিবাট', টনি বলল। 'এখনই নিয়ে আসছি।'

'সরাইখানাটা কেমন লাগছে?' রবিন জিজ্ঞেস করল লোকগুলোকে। 'ঘর কেমন পেলেন? সাগরের দিকে মুখ করানোগুলোর একটা?'

'হ্যাঁ', জবাব দিল রিগার। 'খুব ভালো ঘর।'

'এখানে কি এই প্রথম এলেন?' আবার জিজ্ঞেস করল রবিন, স্বাভাবিক ট্যুরিস্টের প্রশ্ন।

রিক ও রিগার দুজনেই মাথা ঝাঁকাল। উঠে দাঁড়াল কিশোর। 'এখনই আসছি। বাথরুমে যাব।'

'চলো, আমিও যাব', রবিন বলল। 'হাত ধুতে হবে।' রিক ও রিগারের দিকে ফিরে বলল, 'আপনার বসুন। মুসা এখানকার পুরোনো লোক। ওর আন্টির একটা বাড়ি আছে দ্বীপে। সেখানেই উঠেছি আমরা। দ্বীপটা সম্পর্কে অনেক কিছু জানাতে পারবে আপনাদের।'

'এখানে বসতির শুরুটা করেছিল ম্যাকাটুংক ইনডিয়ানরা', মুসা বলল। তারপর গড়গড় করে দ্বীপের ইতিহাস বলে যেতে লাগল। তাতে বিশেষ আগ্রহ আছে বলে মনে হলো না দুই শ্রোতার, তবে ডিনারের জন্য অপেক্ষা করা ছাড়া ওদের আর কিছু করারও নেই, তাই শুনতে লাগল।

'ভালোই বলছে কিন্তু', ডাইনিংরুম থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে ফিসফিস করে রবিনকে বলল কিশোর। 'কিছুক্ষণের জন্য আটকে রাখতে পারবে।'

'দেখা যাক', রবিন বলল। 'লোকগুলো যদি সাগরমুখো ঘর পেয়ে থাকে, তাহলে কোন দিকে পেয়েছে সেটা অন্তত বোঝা গেল। কিন্তু ঠিক কোন ঘরটা, কীভাবে বুঝব?'

'এসো', বলে রবিনকে নিয়ে লবির ডেস্কের সামনে এসে দাঁড়াল কিশোর। কেউ নেই ওখানে। কোনো রকম দ্বিধা না করে রেজিস্ট্রেশন বুকটা টেনে নিয়ে খুলল ও। কোন ঘরে উঠেছে লোকগুলো সহজেই খুঁজে বের করে ফেলল। 'রিক বেরিং, রুম ২২১, আর রিগার জোনস, রুম ২২৩', নিচুস্বরে পড়ল ও।

এক মুহূর্ত দেরি না করে দৌড়ে সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠে বারান্দা দিয়ে এগোল ওরা।

'ভেতরে ঢোকা কঠিন হবে না', কিশোর বলল, 'এত পুরোনো তালা।' পকেট থেকে একটা সুইস আর্মি নাইফ বের করল, কাজে লাগতে পারে ভেবে ছুরিটা সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে। ছুরির ফলাটা ২২১ নম্বর ঘরের হ্যান্ডেলের পাশে দরজার ফাঁকে ঢুকিয়ে দিল। ছুরির হাতল ধরে ওপর দিকে সামান্য একটু ঠেলা দিতেই খুলে গেল তালার লক।

শিস দিয়ে উঠল কিশোর। দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল দুজনে। সাধারণ আসবাবপত্র, একটা বিছানা, ওক কাঠে তৈরি একটা অ্যানটিক ড্রেসার, একটা রকিং চেয়ার, একটা ছোট বেডসাইড টেবিল, তার ওপর রাখা একটা কেরোসিনের বাতি। সারা ঘর খুঁজেও রিক বেরিংকে সন্দেহ করার মতো কিছু পাওয়া গেল না ঘরটায়। রবিন বলল, 'সত্যিই হয়তো এখানে বেড়াতে এসেছে ওরা।' আবার বারান্দায় বেরিয়ে এসে দরজা লাগিয়ে দিল।

'হয়তো', কিশোর বলল। তারপর ২২৩ নম্বর ঘরের দরজা খুলল ও। দ্বিতীয় ঘরটাও প্রথম ঘরটার মতোই। তবে আসবাবপত্রগুলো কিছুটা অন্য রকম। শাটার লাগানো বড় জানালার কাছে রাখা কাঠের ডেস্কটায় দ্রুত খুঁজতে শুরু করল দুজনে। কিশোর দেখতে লাগল ড্রয়ারগুলো খুলে আর রবিন টেবিলের ওপরে রাখা কাগজপত্রগুলো ঘাঁটতে লাগল।

'দেখো, কিশোর', কয়েকটা কাগজ দেখিয়ে বলল রবিন। কিশোরের খোলা একটা ড্রয়ার গেল আটকে। বহু ঠেলাঠেলি আর কসরত করে সেটাকে আবার আগের জায়গায় ঢুকিয়ে দিয়ে উঠে দাঁড়াল ও। কাগজটার ওপর শিরোনাম লেখা রয়েছে 'আইআরসি'। কাগজটাতে খরচের হিসাবের লিস্ট লেখা। এক জায়গায় নোট লেখা রয়েছে—জিনিসপত্র

কনতে কয়েক হাজার ডলার খরচ হয়ে যাবে, এহ যেমন তির-ধনুক, হান্টিং রাইফেল, মাছ ধরা বড়শি, ইত্যাদি। রবিন বলল, 'এরা যদি বেড়াতেই এসে থাকে, এ ধরনের জিনিসপত্রের দরকারটা কী?'

এর চেয়েও অবাক করা আরেকটা জিনিস চোখে পড়ল কিশোরের। ল্যাবরেটরির মালামাল। 'এসব জিনিসের মধ্যে কি স্যালমোনেলা ব্যাকটেরিয়াও ছিল?'

'থাকতে পারে', বিড়বিড় করল রবিন।

'চলো, যাই, আর কিছু দেখার নেই এখানে', কিশোর বলল। 'দেরি করলে লোকগুলো আবার সন্দেহ করতে পারে। তবে পরিশ্রমটা বৃথা যায়নি, কিছু একটা বোধহয় পেয়েছি।'

'কী পেয়েছি?' বুঝতে পারল না রবিন।

জবাব দিল না কিশোর। সে নিজেও ভাবছে। নিচতলায় এসে ডাইনিংরুমে ঢুকতেই তাজা হ্যালিবাটের সুগন্ধ ঢুকল নাকে। পলি আর তার দলবলকে মাছের গন্ধে বিরক্ত ভঙ্গিতে নাক কোঁচকাতে দেখা গেল। ওয়েট্রেস এক প্লেট মাছ নিয়ে বেরোতেই রাগ দমন করতে না পেরে চাপাস্বরে খেঁকিয়ে উঠল পলি, 'মাছ খুনির দল!'

কিশোরদের টেবিলেও খাবার এল। এমনভাবে গিলতে শুরু করল রিক আর রিগার, যেন দ্রুত খাওয়ার প্রতিযোগিতায় বসেছে। 'তোমাদের সঙ্গে কথা বলে খুব ভালো লাগল', খাওয়া শেষে উঠে দাঁড়িয়ে বলল রিগার। 'যেতে হবে এবার। কাল সকালে আবার শিকারে বেরোব, তাই তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়তে চাই।'

'ঠিক আছে, দেখা হবে', মুসা বলল। ওরা দৃষ্টির আড়ালে যেতে না যেতেই বলে উঠল, 'অদ্ভুত না? ক্যানারি দ্বীপে শিকার করা বেআইনি, সবাই জানে সেটা।'

'আইআরসি, আইআরসি', চিন্তিত ভঙ্গিতে বিড়বিড় করল কিশোর। 'মানে কী এর?' তবে মুসা বা রবিন কোনো জবাব দেওয়ার আগেই হঠাৎ চিৎকার দিয়ে বাঁকা হয়ে গেল মুসা। 'আমার পেট!' গুঙিয়ে উঠল ও।

'আমার খারাপ লাগছে', ওদের পেছনের টেবিল থেকে বলল এক মহিলা। তার সঙ্গীও পেট চেপে ধরেছে।

ঘরের চারপাশে চোখ বোলাল কিশোর। একই সমস্যা দেখা যাচ্ছে অনেকেরই। ওদের কীভাবে সাহায্য করা যায় ভাবছে, হঠাৎ মনে হলো অদৃশ্য ছুরি দিয়ে এক পোঁচ মারা হলো ওর পেটে। তীক্ষ্ণ ব্যথা। 'উহ্...রবিন, আমিও অসুস্থ হয়ে যাচ্ছি।' বলেই সামনের দিকে বাঁকা হয়ে গেল ও।

'চলো, ওঠো', রবিন বলল, 'দুজনকেই তাজা বাতাসে নিয়ে যাই।' তাড়াতাড়ি উঠে ঘুরে এগিয়ে এল কিশোর ও মুসাকে সাহায্য করার জন্য।

দুইজনের বগলে দুই হাত ঢুকিয়ে দিয়ে ওদের প্রায় টেনে তুলল রবিন। ধরে ধরে নিয়ে এল বাইরের বারান্দায়। ব্যথায় মুখ বিকৃত হয়ে গেছে মুসার, গোঙাচ্ছে। কিশোরেরও একই অবস্থা। ফ্যাকাশে হয়ে গেছে মুখ। পেটের ভেতরের তীক্ষ্ণ ব্যথায় মনে হচ্ছে বেহুঁশ হয়ে যাবে।

ঠিক এই সময় একজন মানুষ এসে দাঁড়ালেন সেখানে। পকেট থেকে ছোট একটা টর্চ লাইট বের করে মুসার ওপর আলো ফেলে বললেন, আমি ডাক্তার র‍্যান্ডেজ, মিস্টার গিলবার্টের বন্ধু। ভাগ্যিস আজ রাতে সরাইখানায় ডিনার খেতে এসেছিলাম।' মুসার চোখ পরীক্ষা করে তিনি বললেন, 'হুম্, বুঝেছি।' মুসার মতো একইভাবে কিশোরেরও চোখ পরীক্ষা করলেন। তারপর রবিনের দিকে তাকালেন। 'তুমি নিরামিষ খেয়েছিলে, তাই না?'

'হ্যাঁ', জবাব দিল রবিন। 'আপনি জানলেন কী করে?'

'আমাকে জানতে হয়েছে', ডাক্তার র‍্যান্ডেজ জবাব দিলেন। 'যারা যারা মাছ খেয়েছে, সবাই অসুস্থ হয়ে পড়েছে। ওই হ্যালিবাটটা দূষিত।'

'দূষিত?' ঢোক গিলল রবিন।

'হ্যাঁ। তাতে কোনো সন্দেহ নেই আমার।'

'কী দিয়ে দূষিত করা হয়েছে?'

গম্ভীর স্বরে জবাব দিলেন ডাক্তার, 'লক্ষণ দেখে আমার কাছে তো মারাত্মক স্যালমোনেলা বিষ বলেই মনে হচ্ছে।'

সাত

'স্যালমোনেলা!' প্রতিধ্বনি করল যেন রবিন। একবার চোখাচোখি হলো কিশোরের সঙ্গে। ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করল, 'অবস্থা কতটা খারাপ, ডাক্তার?'

'এখনো জানি না', ডাক্তার বললেন। 'শিশু আর বুড়োদের বেলায় খুবই মারাত্মক হয়ে যায় এই বিষ। এই বিষ মেশানো খাবার যে যত বেশি খাবে, তার বেলায় তত বেশি খারাপ হবে। তবে, ভাগ্য ভালো, অ্যান্টিবায়োটিকে খুব কাজ হয়। আমার কাছে যথেষ্ট অ্যান্টিবায়োটিক রেখেছি।'

আঙুল তুলে মুসাকে দেখালেন ডাক্তার। 'এই ছেলেটার অবস্থা বোধহয় বেশি খারাপ।' মুখ ফুলে গেছে মুসার, চোখ বোজা।

'অনেক বেশি মাছ খেয়েছে ও', রবিন জানাল।

গোঁ গোঁ করে গুঙিয়ে উঠে মুসা বলল, 'উফ্, জীবনে আর মাছ খাব না আমি।'

'ডাইনিংরুমে ছোট বাচ্চারাও আছে, ডাক্তার', রবিন বলল। 'ওরাও নিশ্চয় ভুগছে।'

'আমি ওষুধ আনতে যাচ্ছি, আমার অফিসে, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ফিরে আসব', ডাক্তার বললেন 'মিস্টার গিলবার্টের সঙ্গে দেখা হলে ওকে বোলো আমি কোথায় গেছি।' বলে আর এক মুহূর্ত দেরি না করে চলে গেলেন তিনি।

'রবিন', এক হাতে পেট চেপে ধরে কিশোর বলল 'এক্ষুনি শেরিফের কাছে যাও। দেখে এসো, ওই বিষের শিশিটা এখনো তাঁর কাছে আছে কি না।'

মুসা ও কিশোরকে ফেলে যেতে মন চাইল না রবিনের। 'কিন্তু তোমাদেরকে এই অবস্থায় রেখে যাব?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ যাও, আমাদের কিছু হবে না', কিশোর বলল।

'ঠিক আছে, এখনই ফিরে আসব। তোমরা এখান থেকে নোড়ো না।'

'চিন্তা কোরো না', কিশোর বলল। 'আমরা কোথাও যাব না। উফ্‌ফ্‌...'

বারান্দা থেকে নেমে এসে রাস্তা ধরে দৌড় দিল কিশোর। সূর্য ডুবে গেছে। শেরিফের বাড়িতে পৌঁছে সামনের দরজায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল তাঁকে। দরজার তালা ভাঙা। চৌকাঠও টুকরো টুকরো।

'কেউ একজন দরজায় টোকা দিয়ে ঢুকতে ভুলে গেছে', তিক্ত কণ্ঠে রসিকতা করলেন শেরিফ।

'কী হয়েছিল?' জানতে চাইল রবিন।

'চুরি হয়ে যাওয়া ছবিগুলোর কথা আমাকে জানিয়েছে ডিনা মুলার্ট। বুস্টারকে জিজ্ঞেস করতে গিয়েছিলাম সে কিছু জানে কি না। হ্যারির ভাঙা ফাঁদটার কথাও বলতে চেয়েছিলাম। কিন্তু ওকে পাইনি। বাড়ি ফিরে দেখি এই অবস্থা।'

'হয়তো এখানেই ছিল বুস্টার, স্যালমোনেলার শিশিটা চুরি করার জন্য দরজা ভেঙেছে', রবিন বলল।

'কী?' অবাক হয়ে রবিনের দিকে তাকালেন শেরিফ। 'ওটা চুরি গেছে, এ ধারণা হলো কেন তোমার?'

'অনুমান', শুকনো কণ্ঠে বলল রবিন। 'সরাইখানায় অনেক মানুষ অসুস্থ হয়ে গেছে। ডাক্তার বললেন, স্যালমোনেলার আক্রমণ।'

'এসো তো দেখি', গম্ভীর কণ্ঠে বললেন শেরিফ। রবিনকে নিয়ে ঘরে ঢুকলেন তিনি। রান্নাঘরের পাশের একটা ঘরে এসে একটা ড্রয়ার খুললেন। 'নেই', একবার দেখেই বলে উঠলেন তিনি। 'আর আমি এদিকে ভাবছিলাম, কিছুই চুরি করেনি, তাহলে ঘরে ঢুকল কেন?'

'কিশোর আমাকে বলেছে, আজ যখন ও আপনার বাড়ি থেকে বেরিয়ে চলে যাচ্ছিল, তখন বুস্টারকে বাড়ির পেছনে লুকিয়ে থেকে আপনার ওপর নজর রাখতে দেখেছে', জানাল রবিন।

'হুঁ, এখন বিশ্বাস হচ্ছে', নিজের চিবুকে আস্তে আস্তে টোকা দিতে লাগলেন শেরিফ। 'আমি বুঝতে পারিনি, ওকে যখন ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল, তখন কতটা খারাপ হয়ে গেছে ও।'

'ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল?' ভুরু কোঁচকাল রবিন। 'এর মানে কী?'

অন্যদিকে চোখ ফেরালেন শেরিফ। 'মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল', বিড়বিড় করে বললেন তিনি। রবিনের দিকে তাকালেন আবার। 'ওর মাকে আমি কথা দিয়েছিলাম, এ কথা কাউকে বলব না। কিন্তু এখন...'

'শেরিফ', জোর দিয়ে বলল রবিন, 'যা যা জানেন, আমাদের বলতে হবে!'

মাথা নাড়লেন শেরিফ। 'সরি, আমি বলতে পারব না। আমি ওর মায়ের কাছে প্রতিজ্ঞা করেছি।'

'তাহলে চলুন, ওর মায়ের সঙ্গেই কথা বলি', রবিন বলল।

জোরে নিঃশ্বাস ফেললেন শেরিফ। 'ছয় মাস আগে মহিলা মারা গেছে, রবিন। তবে চেষ্টা করলে বুস্টারের সম্পর্কে সব খবর জানতে পারবে তোমরা। আমি বরং এখন সরাইখানায় যাই, দেখি কোনো সাহায্য করতে পারি কি না। বুস্টারের সঙ্গে পরে কথা বলব আমি। দ্বীপ থেকে বেরিয়ে কোথাও পালাতে পারবে না।'

'সে চেষ্টা না করলেই ভালো করবে', চাপাস্বরে বলল রবিন। 'ও এখন নিশ্চিত হয়ে গেছে, বুস্টারই অপরাধী। দ্বীপের অঘটনগুলো সে-ই ঘটাচ্ছে। এমন কিছুই করেছে ও, যেটা খুব খারাপ, যা কাউকে না বলতে প্রতিজ্ঞা করিয়ে ছেড়েছে ওর মা।

এসব শুনলে কিশোর কি বলবে অনুমান করতে পারছে রবিন, কিশোর বলবে: 'অপরাধ প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত কাউকে অপরাধী বলা যায় না।' মনে মনে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল রবিন, বুস্টারের গোপন কথা না জেনে ক্ষান্ত হবে না।

শেরিফের সঙ্গে সরাইখানায় ছুটল রবিন। এসে দেখল, খাবার খেয়ে যারা অসুস্থ হয়ে পড়েছে, সবাই গিয়ে যার যার রুমে শুয়ে পড়েছে। কর্মচারীরা সবাই ভীষণ ব্যস্ত। পরিষ্কার তোয়ালে, গরম চা, এসব নিয়ে ঘরে ঘরে ছোটাছুটি করছে। ভাগ্য ভালো, ওদের কেউ অসুস্থ হয়নি, কারণ, কেউই ওই মাছ খাওয়ার সময় পায়নি।

অ্যাকর্ন সোসাইটির সদস্যরা অসুস্থদের সেবা করায় ওদের সাহায্য করছে। পলি বার্জেনের চেহারায় বেশ একটা আত্মতৃপ্তির ভাব লক্ষ করল রবিন, একজন সদস্যকে উদ্দেশ্য করে বলতেও শুনল, এবার যদি গিয়ে হুঁশ হয় এই লোকগুলোর, মাছ খাওয়া বন্ধ করে। অবাক হয়ে ভাবল রবিন, খাবারে স্যালমোনেলা এই মহিলাই মিশিয়ে দেয়নি তো!

পেছনের বারান্দার সিঁড়িতে মুসা ও কিশোরকে বসে থাকতে দেখল রবিন। ভীষণভাবে ঘামছে মুসা, তবে কিশোরের অবস্থার কিছুটা উন্নতি হয়েছে মনে হলো।

এ সময় শেরিফ এসে হাজির হলেন সেখানে। জিজ্ঞেস করলেন, 'কী খবর তোমাদের, বাড়ি যেতে পারবে?'

'বুস্টারকে ডেকে আনতে লোক পাঠানো হয়েছে', গম্ভীর কণ্ঠে বলল কিশোর। 'ওর ট্রাক নিয়ে আসবে।'

'ভালো', রবিন বলল। 'ওকে কয়েকটা কথা জিজ্ঞেস করব আমি।'

রবিনের কথা শেষ হতে না হতেই ঝরঝরে পিকআপ ট্রাকটা নিয়ে হাজির হলো বুস্টার। গাড়ির পেছনে উঠতে কিশোরকে সাহায্য করল রবিন, আর মুসাকে সাহায্য করলেন শেরিফ। কিশোর ও মুসা দুজনেই চিত হয়ে শুয়ে পড়ল। শেরিফকে জিজ্ঞেস করল বুস্টার, 'দূষিত মাছ, তাই না?'

'মনে হয়', চিন্তিত ভঙ্গিতে জবাব দিলেন শেরিফ। কড়া চোখে বুস্টারের দিকে তাকালেন। 'একটু আগে তোমার বাড়িতে গিয়েছিলাম। তোমাকে পাইনি।'

'তাই', বুস্টার শুধু বলল। কোথায় গিয়েছিল, বলল না। ট্রাকের ড্রাইভিং সিটে বসে টান দিয়ে দরজাটা লাগিয়ে দিল। তাড়াহুড়ো করে পাশের প্যাসেঞ্জার সিটে উঠে বসল রবিন। শেরিফের উদ্দেশে হাত নাড়ল।

হক'স হিল রোড ধরে এগিয়ে চলল ট্রাক। রবিন

জিজ্ঞেস করল, 'শেরিফ যখন আপনার বাড়িতে গিয়েছিল, আপনি তখন কোথায় ছিলেন?'

রাস্তার ওপর দৃষ্টি স্থির রাখল বুস্টার। কাজে। এখানে অনেক কাজ আমার। কেন, কোনো সমস্যা?'

'সত্যি বলতে কি, অনেক সমস্যা', রবিন জবাব দিল। 'আর সেগুলো নিয়ে আপনার সঙ্গে কথা বলতে চাই।'

'আমি বেশি কথা বলতে পছন্দ করি না', বলে চুপ হয়ে গেল বুস্টার। পাহাড়ের ওপরে উঠে গাড়ি থামাল। 'ওই যে তোমাদের বাড়ি। তোমার বন্ধুদের নামতে সাহায্য করছি। তারপর ভেতরে নিয়ে যাব।' গাড়ির পেছন থেকে মুসা ও কিশোরকে নামতে সাহায্য করল রবিন ও বুস্টার। ধরে ধরে বাড়ির ওপরতলায় নিয়ে এল। ওদের ঘরে রেখে বুস্টারের সঙ্গে নিচতলায় নামল রবিন। বুস্টার বলল, 'দশ ডলার ভাড়া দিতে হবে।'

অবাক হয়ে মাথা নাড়ল রবিন। 'পয়সা ছাড়া শুধু মানবিকতা দেখাতে কি কখনো কোনো কাজ করেন না আপনি?'

'আমার খেয়ে-পরে বাঁচতে হবে', দরজার দিকে এগোতে এগোতে বুস্টার জবাব দিল। 'তোমার বন্ধুরা অসুস্থ হয়েছে, সেটা আমার দোষ নয়।'

'সত্যিই কি তাই?' বুস্টারের সঙ্গে বারান্দায় বেরিয়ে এল রবিন। পকেট থেকে একটা ১০ ডলারের নোট বের করে দিল।

'গুড নাইট' জানিয়ে, ট্রাকে চেপে চলে গেল বুস্টার।

ভেতরে যাওয়ার জন্য ঘুরতে যাবে রবিন, এ সময় দরজার নিচে একটা কাগজ আটকে থাকতে দেখল। আগে থেকেই বোধহয় ছিল ওটা, ওর চোখে পড়েনি। কাগজটা তুলে নিল। পেনসিল দিয়ে তাতে লেখা রয়েছে: ছবিগুলো কোথায় আছে জানি আমি। ওল্ড বার্নার শ্যাকে আমার সঙ্গে দেখা করো। একা।

কাগজটা নিয়ে লাফাতে লাফাতে এসে নিজেদের ঘরে ঢুকল রবিন। বালিশে পিঠ দিয়ে আধশোয়া হয়ে আছে কিশোর। মুখ এখনো ফ্যাকাশে।

'কেমন লাগছে এখন?' জিজ্ঞেস করল রবিন।

'অনেকটাই ভালো', জোর করে মুখে হাসি ফোটাল কিশোর। 'বেশি খাওয়ার সময় পাইনি, ভাগ্যিস।'

'এটা দেখো', কাগজটা বাড়িয়ে দিল রবিন।

নোটটা পড়ে রবিনের দিকে তাকাল কিশোর। 'চলো', পায়ের কাছে টেনে দেওয়া কম্বলটা একটানে ফেলে দিল ও। 'বার্নার শ্যাকটা কোথায় জানি আমি, ম্যাপে দেখেছি। পুরোনো গোরস্থানের কাছে, ক্লোভার বি রোডের পাশে।'

'আরে দাঁড়াও!' বাধা দিল রবিন। 'তুমি অসুস্থ, অন্তত চব্বিশ ঘণ্টা শুয়ে থাকতে হবে, ডাক্তারের হুকুম!'

'জাহান্নামে যাক হুকুম!' বিছানা থেকে নেমে জিনসের প্যান্টের দিকে হাত বাড়াল ও। 'বিষয়টা খুব জরুরি।'

রবিন জানে, কিশোরকে এখন আর থামাতে পারবে না। তাই কাপড় পরতে বাধা দিল না। ঘর থেকে বেরোল দুজনে। মুসার ঘরে উঁকি দিয়ে দেখল, ও ঘুমাচ্ছে। ওকে জাগাল না। বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল ওরা। দুজনের হাতেই টর্চ। কিশোর বলল, 'হক'স হিল রোডের শেষ মাথায় গিয়ে বাঁয়ে মোড় নিলে ক্লোভার বি রোড। ওই রাস্তাটা ধরে এগোলেও পাওয়া যাবে বার্নার শ্যাক।'

পাঁচ মিনিট পর বাড়িটার ধ্বংসাবশেষের ওপর আলো ফেলল ওরা। চালাটা এমনভাবে বসে গেছে ভেতর দিকে, দেখলে মনে হয় যেকোনো মুহূর্তে ভেঙে পড়বে। বহুকাল আগে ফেলে যাওয়া হয়েছে এটা। 'এটাই সেই জায়গা', কিশোর বলল। 'চলো, ঢুকি।'

'হ্যালো?' বাড়ির ভেতর ঢুকে ডেকে বলল রবিন। পুরোনো মাছের গন্ধে ভারি হয়ে আছে ঘরের বাতাস। 'কেউ আছেন?' জবাবে শুধুই নীরবতা। কেউ সাড়া দিল না।

চারপাশে আলো ফেলে দেখল কিশোর। আচমকা চেঁচিয়ে উঠল, 'রবিন, দেখো! ছবিগুলো!'

একটা পুরোনো, ভেঙে পড়া কড়িকাঠের গায়ে ঠেস দিয়ে রাখা হয়েছে কলি জেসনের আঁকা ছবিগুলো।

ছবির ওপর আলো ফেলে হাঁ করে তাকিয়ে রইল রবিন। 'ছুরি দিয়ে চিরে কেউ এখানে ফেলে রেখে গেছে! একেবারেই নষ্ট করে ফেলেছে!'

কিছু বলার জন্য মুখ খুলল কিশোর, কিন্তু বলার সুযোগ আর পেল না। কাঠ ভাঙার মৃদু শব্দ হলো, বাড়তে লাগল শব্দটা।

'কিশোর!' চেঁচিয়ে উঠল রবিন। 'জলদি বেরোও! ছাদ ধসে পড়ছে।'

কিশোরের হাত চেপে ধরে টেনে দরজার দিকে নিয়ে চলল রবিন। তবে দেরি হয়ে গেছে। মড়াৎ করে তীক্ষ্ণ শব্দ হলো, পরক্ষণে হুড়মুড় করে ওদের ওপর ভেঙে পড়ল চালাটা।

আট

সবকিছু কালো। কিশোরের সারা গায়ে ব্যথা। মনে হচ্ছে যেন হকিস্টিক দিয়ে এলোপাতাড়ি পেটানো হয়েছে ওকে। মাথা দপদপ করছে। টের পেল, ডান হাতের আঙুলের মাথা থেকে রক্ত বেরোচ্ছে। 'রবিন?' ডাকল ও। 'রবিন, তুমি ঠিক আছো?'

জবাব পেল না। ভীষণভাবে আতঙ্কিত হয়ে পড়ল। গায়ের ওপর পড়ে থাকা পুরোনো পচা কাঠের দঙ্গল ঠেলে সরিয়ে, ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল। মাথার ওপরে যে জায়গাটা ধসে পড়েছে, ছাদের সেই ফোকর দিয়ে তারা দেখা যাচ্ছে।

'রবিন?' আবার ডাকল ও। বাড়ি লেগে হাত থেকে খসে পড়েছে টর্চটা, হাতড়ে বের করার চেষ্টা করল সেটা। পেল না। মেঘের আড়ালে ঢাকা পড়ে থাকা চাঁদটা বেরিয়ে এলে সামান্য আলো পাওয়া গেল।

কড়িকাঠের নিচ থেকে একটা হাত বেরিয়ে থাকতে দেখে বরফের মতো জমে গেল যেন কিশোর। হাতটা নড়ছে না।

'রবিন!' চিৎকার দিয়ে সেদিকে ছুটল কিশোর। গায়ের সমস্ত শক্তি দিয়ে ঠেলে সরালো কাঠটা। এত বেশি জঞ্জালের নিচে চাপা পড়ে আছে রবিন, বাতাস আছে কি না, শ্বাস নিতে পারছে কি না ও, বুঝতে পারছে না কিশোর।

অবশেষে ভাঙা তক্তার আড়াল থেকে রবিনকে প্রায় খুঁড়ে বের করল ও। টেনে সরিয়ে আনল কিছুটা পরিষ্কার জায়গায়। 'রবিন! তুমি ঠিক আছো?' প্রশ্ন করল উদ্বিগ্ন কিশোর। হাঁটু গেড়ে বসেছে রবিনের পাশে।

মিটমিট করে একসময় খুলে গেল রবিনের চোখের পাতা। গুঙিয়ে উঠে জিজ্ঞেস করল, 'কী হয়েছে?'

'ছাদটা আমাদের মাথায় পড়েছিল', জবাব দিল কিশোর। 'তুমি ঠিক আছো?'

'আমি...তোমার ডাক শুনেছি', উঠে বসার চেষ্টা করল রবিন। 'কিন্তু কড়িকাঠের নিচে এমনভাবে চাপা পড়েছিলাম, জবাব দিতে পারিনি। এখন মনে হয় ঠিকই আছি।'

'আমাদের ভাগ্য ভালো কাঠগুলো পচে গেছে', কিশোর বলল। 'তা ছাড়া উইপোকায় চিবিয়ে ফোঁপরা বানিয়ে হালকা বানিয়ে দিয়েছে। নইলে এতক্ষণে দুজনেই মরে থাকতাম আমরা।'

উঠে দাঁড়াল কিশোর। চাঁদের আলোয় চারপাশের ধ্বংসস্তূপের দিকে তাকাল। কিছু একটা চোখে পড়তে এগিয়ে এসে হাঁটু গেড়ে বসল কড়িকাঠটার পাশে। 'আরে! এটা তো করাতে কাটা মনে হচ্ছে', কাঠটা যেখানে দুই টুকরো হয়ে ভেঙে পড়েছে, সেখানে আঙুল বোলাল ও। 'দুর্ঘটনা নয়। চালাকি করে কেউ আমাদেরকে এখানে টেনে নিয়ে এসেছিল মেরে ফেলার জন্য।'

'বাহ্, চমৎকার', রবিন বলল। 'তার মানে রহস্যটা সমাধানের দিকে এগিয়ে চলেছি আমরা, সেজন্য ভয় পেয়ে শেষ করে দিতে চাইছে। নইলে মারতে চাইবে কেন?'

'এখন থেকে আরও বেশি সাবধান থাকতে হবে আমাদের', গম্ভীর কণ্ঠে কিশোর বলল। 'নইলে কলির আঁকা ওই ছবিগুলোর মতোই ধ্বংস হয়ে যাব যে কোনো সময়।'

উঠে দাঁড়িয়ে কাপড় থেকে ময়লা ঝাড়তে লাগল রবিন। 'তোমার কী অবস্থা, তুমি ঠিক আছো?'

'একটা হাত একটু ব্যথা করছে, তবে তেমন কিছু না', কিশোর বলল। 'তোমার কী অবস্থা?'

'আমার পা কেটেছে, গা টলছে, তবে বেঁচে আছি', জবাব দিল রবিন। 'এরচেয়ে ভালো আর কী চাও?'

'চলো,' কিশোর বলল, 'বাড়ি যাই।' প্রায় খোঁড়াতে খোঁড়াতে, শুধু চাঁদের আলোয় পথ দেখে, পাহাড়ি পথ বেয়ে এমিলির বাড়িতে ফিরে চলল ওরা। বাড়ি পৌঁছে দেখল, মুসা তখনও গভীর ঘুমে অচেতন। গায়ের অনেক জায়গায় কেটে-ছড়ে গেছে দুজনের। ভালোমতো সেগুলো পরিষ্কার করে, ফার্স্ট এইড বক্স থেকে ওষুধ লাগিয়ে শুয়ে পড়ল। বালিশে মাথা রাখতেই অদ্ভুত এক ক্লান্তি যেন চেপে ধরল কিশোরকে। যা যা ঘটেছে, সেটা কল্পনা করতে গিয়ে পেটের ব্যথা ভুলে গেল। রবিনের চাপা মৃদু নিঃশ্বাসের শব্দ কানে আসছে। ঘুমিয়ে পড়েছে ও। প্রচণ্ড অবসাদ সত্ত্বেও ঘুমোতে পারছে না কিশোর, সারা দিনে যা যা ঘটেছে, সেসব মাথায় ঘুরছে। যা-ই হোক, অনেকক্ষণ অস্বস্তিকরভাবে এপাশ ওপাশ আর ছটফট করার পর অবশেষে ঘুমিয়ে পড়ল।

পরদিন সকালে ঘুম ভাঙতে অনেকটা সুস্থ বোধ করল কিশোর। পেটের ব্যথা কমে গেছে, নেই বললেই চলে। চালার কাঠ পড়ে হাতে যেখানে ব্যথা পেয়েছিল, সেজায়গাটা বেঁধে নিতেই দেহের কষ্ট বলে আর কিছু রইল না। গত সন্ধ্যায় মাছ খেয়ে যারা অসুস্থ হয়েছিল, তাদের কথা ভাবল। আশা করল, এতক্ষণে সবাই সুস্থ হয়ে গেছে।

'পায়ের অবস্থা আরও খারাপ হতে পারত', বিছানা থেকে নামল রবিন। কাপড় পরতে সামান্য অসুবিধে হলো। হাঁটতে গিয়ে পা ফেলার সময় এখনো খোঁড়াচ্ছে। 'তবে কেউ যদি ভেবে থাকে মাথায় চালা ফেলে আমাকে থামিয়ে দেবে, তাহলে ভুল করেছে।'

কাপড় পরা শেষ করে মুসার ঘরে এল দুজনে। মুসার বিছানার পাশে বসে জিজ্ঞেস করল কিশোর, 'কেমন লাগছে এখন?'

'ভয়ানক', গুঙিয়ে উঠল মুসা, চোখ বোজা। 'তোমরা যাও, ঘুরে এসো। আমি নড়তেও পারছি না। কী যে বেড়াতে এলাম!'

'ঠিক আছে, থাকো, ঘুমাও', কিশোর বলল।

'রবিন, চলো যাই। আগে ডিনার সঙ্গে দেখা করব। তারপর কফি শপে নাশতা খেতে যাব।'

পাহাড়ি রাস্তা বেয়ে দ্রুত নেমে এসে গ্যালারিতে চলল দুজনে। সবে তখন দোকান খুলেছেন ডিনা। বার্নার শ্যাকে কী ঘটেছে শুনে সুন্দর মুখটা হাঁ হয়ে গেল। 'তোমরা যে ভালো আছো, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ', বললেন তিনি। 'এত সুন্দর ছবিগুলো নষ্ট করে দিয়েছে শুনে কী যে খারাপ লাগছে! এ ঘটনার পর আর এখানে থাকবে না কলি, চিরকালের জন্য ক্যানারি ছেড়ে চলে যাবে।'

ওদেরকে নিয়ে বাইরে এলেন ডিনা। গ্যালারির দরজায় তালা লাগালেন। 'ছবিগুলোর কী পরিণতি হয়েছে, সেটা অন্য কারও মুখ থেকে শোনার আগে আমার মুখ থেকেই শুনুক, কলি। আর যে এ কাজ করেছে, তাকে ধরার ব্যবস্থা করা দরকার, যত তাড়াতাড়ি পারা যায়।'

'আমরা এখনই সেটা নিয়ে কাজ শুরু করব', রবিন বলল। 'কিশোর, চলো, শেরিফের সঙ্গে কথা বলা যাক।'

শেরিফের সঙ্গে দেখা করার আগে কফি শপে ঢুকে দ্রুত নাশতা সেরে নিল দুজনে। তারপর শেরিফের বাড়িতে চলল। আঙিনায় রয়েছেন শেরিফ বাক, হাসিমুখে ওদের স্বাগত জানালেন, তবে সব কথা শোনার পর হাসি উধাও হয়ে গেল তাঁর।

'স্টেট পুলিশকে খবর দেওয়ার সময় হয়ে গেছে, বাক', কিশোর বলল। 'গতরাতে আমি আর রবিন আরেকটু হলেই মারা যেতাম।'

'না, আমি সেটা করতে পারব না', শেরিফ বললেন। 'স্টেট পুলিশকে খবর দিলেই পত্রিকাগুলো জেনে যাবে। আর পত্রিকায় এসব ঘটনা প্রকাশিত হলে দ্বীপের সর্বনাশ হয়ে যাবে।'

'এমনিতেও সর্বনাশের আর খুব বেশি বাকি নেই', রবিন বলল। 'অনেক ট্যুরিস্টই নিশ্চয় এতক্ষণে ব্যাগ-সুটকেস গোছাতে শুরু করেছে। যারা অন্তত স্যালমোনেলার বিষক্রিয়া থেকে সেরে উঠেছে।'

ঠোঁট কামড়ালেন বাক, গাল চুলকালেন। 'এক কাজ করা যেতে পারে। মেইনল্যান্ডে আমি নিজে গিয়ে যদি পুলিশের সঙ্গে কথা বলি, বিষয়টা পত্রিকায় প্রকাশিত না হতে দেওয়ার গুরুত্ব বোঝাতে পারি, তাহলে হয়তো কাজ হবে। সাহায্যও পাব, দ্বীপটারও সর্বনাশ হবে না।'

'কাল রাতে বুস্টারের ওপর নজর রাখতে পেরেছিলেন?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'চেষ্টা করেছি', জবাব দিলেন শেরিফ। 'তবে গাড়িতে করে তোমাদেরকে যখন বাড়ি পৌঁছে দিতে গেল, তারপর থেকে আর পারিনি। হক'স হিল রোড বেয়ে আমি যখন উঠছিলাম, অর্ধেক পথ যেতে না যেতেই তোমাদের নামিয়ে দিয়ে এসে, আমার পাশ কাটিয়ে চলে গিয়েছিল। তবে পিছু ছাড়িনি। বার্নার শ্যাকে বোধহয় ওকেই ঘোরাফেরা করতে দেখেছি, তারপর আবার হারিয়ে ফেলেছি ওকে।'

'বার্নার শ্যাক!' ভুরু কুঁচকে গেল রবিনের। কিশোরের দিকে তাকাল। 'কিশোর, আমার মনে হয় বুস্টারই সমস্ত গণ্ডগোলের হোতা। যেখানেই কোনো কিছু ঘটেছে, সেখানেই দেখা গেছে ওকে।'

'কিন্তু, কোনো প্রমাণ না পেলে ওকে অ্যারেস্ট করতে পারব না আমি', নিজের হাতঘড়ির দিকে তাকালেন শেরিফ। 'এখন মেইনল্যান্ডে আমার বসের সঙ্গে দেখা করতে যেতে হলে তাড়াতাড়ি করতে হবে আমাকে। আর বিশ মিনিটের মধ্যেই রওনা হয়ে যাবে সি স্টার।'

বাকের সঙ্গে জাহাজঘাটায় এল কিশোর ও রবিন। পৌঁছে দেখল বোটের সিঁড়ি নামিয়ে দেওয়া হয়েছে। চার বাচ্চাওয়ালা পরিবারটাকে আসতে দেখল। মা-বাবার মুখ এখনো ফ্যাকাশে, কিন্তু বাচ্চাগুলোর মুখ উজ্জ্বল, প্রাণশক্তিতে ভরা।

'বেড়ানো বাদ দিয়ে দিয়েছি', কাছে আসার পর কিশোরকে জানাল বাবা। 'আমার স্ত্রী প্রচণ্ড ভয় পেয়েছে, আবার কোনো বিষক্রিয়ার ঘটনা ঘটতে পারে ভেবে।'

'আমি মাছের গন্ধ সহ্য করতে পারি না', বলে উঠল ওদের বড় ছেলেটা, 'মাছ খাই না, তাই ভালো আছি।'

ওর ভাইবোনেরাও মাছ খায় না, জানা গেল।

কিশোরের কাঁধে হাত রাখলেন শেরিফ। 'এখন তোমরা ঘুরতে যেতে পারো। সি স্টারের পরের ট্রিপেই ফিরে আসব আমি, তখন দেখা হবে।'

শেরিফকে গুড বাই জানিয়ে ঘুরে দাঁড়াল কিশোর ও রবিন। বাঁশি বাজিয়ে, রওনা হওয়ার সংকেত ঘোষণা করল ফেরিবোট।

'চলো, রবিন, হাঁটি', কিশোর বলল। 'এই কেসটা নিয়ে ভাবা দরকার। মনে হচ্ছে হাঁটার সময় মাথা খুলবে আমার।'

'কী আর ভাবব?' রবিনের প্রশ্ন। 'সবকিছুই বুস্টারের দিকে ইঙ্গিত করছে। এ দ্বীপের সমস্ত অঘটনগুলোর জন্য ও-ই দায়ী। বাক কী বললেন সেটা তো শুনলেই, গতরাতে বার্নার শ্যাকের কাছেও নাকি দেখা গেছে ওকে। কাল সকালে কলির ছবিগুলো যখন চুরি হয়েছে, তখনো গ্যালারিতে ঢুকেছিল ও। যেখানেই গণ্ডগোল, সেখানেই ও হাজির।'

'সবই ঠিক আছে, রবিন, কিন্তু কিছুতেই বুস্টারকে আমি অপরাধী ভাবতে পারছি না', ভ্রূকুটি করল কিশোর। 'সব অপরাধেরই একটা উদ্দেশ্য বা মোটিভ থাকে, ওর মোটিভটা কী?'

'বুস্টারের উদ্দেশ্য? ইয়ে, উম্...' ভাবতে গিয়ে ঠোঁটে ঠোঁট চেপে বসল রবিনের। কিছুক্ষণ চিন্তা করে অনিচ্ছা সত্ত্বেও স্বীকার করল, 'নাহ্, ওর কোনো মোটিভ খুঁজে পাচ্ছি না।'

'এ দ্বীপের ট্যুরিস্ট ব্যবসা ধ্বংস হয়ে গেলে ওর কী লাভ?' ভুরু নাচাল কিশোর। 'আর্ট গ্যালারির ব্যবসা নষ্ট করেই বা কী লাভ ওর? কোনো জবাব পাচ্ছি না আমি। বরং, দ্বীপের এসব ব্যবসার ওপরই জীবিকা নির্ভর করে ওর।'

'দেখে তো মনে হয় প্রচণ্ড পরিশ্রমী,' শহরের ভেতর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে হক'স হিল রোডের দিকে এগোল দুজনে। 'সব সময় কীভাবে একটা ডলার বেশি আয় করবে, সেই চিন্তায় থাকে।'

'হুঁ। এখন পলি বার্জেনের কথা ধরা যাক', কিশোর

বলল। 'ওর একটা মোটিভ আছে। মাছধরা শিল্পটাকে বন্ধ করতে পারলে খুশি হয় ও। মানুষকে মাছ থেকে দেখলে যে পরিমাণ বিরক্ত হয় ও, তাতেই বোঝা যায়। ট্যুরিস্টদেরও পছন্দ করে বলে মনে হয় না। ওর মতে, বেশি লোক দ্বীপের প্রাকৃতিক পরিবেশের ওপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে।'

'কিন্তু', যুক্তি দেখাল রবিন, 'মানুষের কাছে ওর মেসেজ পৌঁছে দেওয়ার জন্য তো বেশি লোকের সমাগমই ভালো, যত বেশি লোকে জানবে, ওর কথা তত বেশি ছড়াবে, লোকে সচেতন হবে। তা ছাড়া চিত্রশিল্পের ব্যবসাটাকে ধ্বংস করেই বা ওর কী লাভ?'

হঠাৎ পেছন থেকে একটা কণ্ঠ শুনে চমকে উঠল দুজনে।

'আরে দেখো, কারা! এই, ক্যানারি আইল্যান্ড কেমন লাগছে তোমাদের?'

পাক খেয়ে ঘুরে দাঁড়াল দুই গোয়েন্দা। ক্যানিকে দেখল, সি স্টার ফেরিবোটের ক্যাপ্টেন ক্রিমসন রোজার। হেঁটে এগিয়ে এলেন গোয়েন্দাদের দিকে।

'আপনি জাহাজ ফেলে এখানে কী করছেন?' হাসিমুখে জিজ্ঞেস করল কিশোর। ক্যানির কাঁধের ওপর দিয়ে তাকিয়ে দেখতে পেল, দ্বীপ থেকে ক্রমশ দূরে সরে যাচ্ছে ফেরিটা, মূল ভূখণ্ডের দিকে চলেছে।

'আমি এখন বুড়ো হয়েছি, তাই আমার স্ত্রী আর পরিশ্রম করতে দিতে চায় না আমাকে, মাঝে মাঝে বোট চালানো বাদ দিয়ে বিশ্রাম নিতে বলে', ক্যানি জানালেন। 'প্রতি সপ্তাহে তিন দিন বিকেলের ট্রিপে আমার ফার্স্ট মেটকে জাহাজ চালানো শেখাই, ওকে ক্যাপ্টেনের দায়িত্ব দিয়ে দিই। তা, কোথায় যাচ্ছ তোমরা? পাহাড়ে চড়বে? খুব ভালো। আজকের দিনটাও খুব চমৎকার।'

'এখন পাহাড়ে চড়ার ইচ্ছে নেই', কিশোর বলল। 'এখন আমরা কয়েকটা সমস্যা নিয়ে ভাবছি। আমরা দ্বীপে আসার পর থেকে বেশ কিছু ঝামেলা হয়েছে।'

'আমি এই কয়দিন মেইনল্যান্ডে ছিলাম, তাই কিছু জানতাম না', ক্যানি বললেন। 'তবে আজ সকালে ফিরে এসে মিস্টার গিলবার্টের কাছে সব শুনেছি', কিশোরদের পেছন পেছন হাঁটতে লাগলেন তিনি। গম্ভীর ভঙ্গিতে মাথা নেড়ে বললেন, 'খাবারে বিষক্রিয়া, ছবি চুরি। খুব খারাপ!'

'ক্যানি, যেখানেই কোনো সমস্যা হচ্ছে, সেখানেই বুস্টার মরিসনের উপস্থিতি দেখা যাচ্ছে', কিশোর বলল, আশা করল, জাহাজে যেভাবে অনর্গল কথা বলেছেন ক্যাপ্টেন, ডাঙাতেও তা-ই করবেন। 'ওর সম্পর্কে কতখানি জানেন আপনি?'

'বুস্টার মরিসন, তাই না? গোলমালে সে-ও জড়িয়েছে', ক্যাপ্টেন বললেন। 'ছয় মাস আগে ওর মা মারা গেছে, শুনেছ বোধহয়। এরপর পরই দ্বীপে আসে বুস্টার, একজন মুক্ত মানুষ হিসেবে। ওর সাজার সময় শেষ করে এসেছে।'

'তার মানে জেলে ছিল?' চোখ বড় বড় হয়ে গেল রবিনের।

'ডিটেনশন সেন্টারে ছিল, টিনএজদের যেখানে রাখা হয়', শুধরে দিলেন ক্যাপ্টেন। 'ছয় মাসের সাজা হয়েছিল ওর—মারাত্মক অস্ত্র নিয়ে হামলা চালানোর অপরাধে বা ও রকমই কোনো কিছু হবে। তবে লঘু পাপে গুরুদণ্ড হয়েছিল বলে আমার ধারণা।'

'কী ধরনের পাপ?' জানতে চাইল কিশোর।

'ঘটনাটা যখন ঘটে আমি তখন ওখানে ছিলাম না, অন্য কেউই ঘটনাস্থলে ছিল না। তবে কোনো ধরনের ঝামেলায় জড়িয়েছিল বাক উইনারের সঙ্গে। এতটাই খেপে উঠেছিল, রাইফেল নিয়ে বাকের বাড়িতে গিয়ে ওর ওপর চড়াও হয়েছিল।'

'বাক? অপরাধটা শেরিফ বাক উইনারের বিরুদ্ধে?' বলল বিস্মিত কিশোর।

'এ কারণেই ভুগতে হয়েছে বুস্টারকে, সাজাটা অনেক বেশি কঠিন হয়েছে', ক্যানি বললেন। 'আর তাতে লরা মরিসনের হৃদয় ভেঙে গিয়েছিল। শেরিফকে অনেক অনুরোধ করেছিল লরা, যাতে বুস্টারের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন না করে। ছেলেকে যে শুধু ভালোইবাসত লরা, তা নয়, খাওয়া-পরাও নির্ভর করত একমাত্র ছেলের আয়ের ওপর। বাবা মারা যাওয়ার পর থেকেই—তখন বুস্টারের বয়স মাত্র এগারো—নানা ধরনের কাজ করে এসেছে বুস্টার। ভীষণ পরিশ্রমী ছেলে।'

'বাকের ওপর এত খেপে গিয়েছিল কেন?' জানতে চাইল রবিন।

'আমি সেটা ঠিক জানি না', ক্যানি বললেন। 'তবে গুজব আছে ট্যাক্সের ব্যাপারে কোনো কিছু। বাক এখানে একই সঙ্গে শেরিফ ও ট্যাক্স কালেক্টর। এত ছোট একটা জনবসতিতে একজন মানুষকেই অনেক ধরনের কাজ করতে হয়। কেউ সময়মতো ট্যাক্স না দিলে ভীষণ রেগে যায় বাক। বিধবা লরা মরিসনের পক্ষে ওর নিজের বাড়ির ট্যাক্স দিয়ে জায়গাটা ধরে রাখা খুব কঠিন হয়ে উঠেছিল।'

'কতখানি জমি ছিল মহিলার?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'ও, অনেকখানি, দ্বীপের প্রায় চার ভাগের এক ভাগ, বেশিও হতে পারে', ক্যানি বললেন। 'আসলে, দ্বীপ রক্ষার জন্য স্পেশাল অ্যাগ্রিমেন্টের বুদ্ধিটাও প্রথমে বুস্টারের বাবার মাথা থেকেই বেরিয়েছিল। খুব ভালো মানুষ ছিল ও। বন ভালোবাসত, সাগর ভালোবাসত। খুব অল্প বয়সে মারা গিয়েছিল। একদিন মাছ ধরতে বেরিয়ে আর ফেরেনি।'

'বুস্টারের মা কি তাঁর জায়গাটা ধরে রাখতে পেরেছেন?' জিজ্ঞেস করল রবিন।

'এটা আমি তোমাদের বলতে পারব না', ক্যানি বললেন। 'কাউকে ওসব নিয়ে আলোচনা করতে শুনলে বাক খুব রেগে যায়।'

'রেকর্ড তো নিশ্চয় আছে', উজ্জ্বল হয়ে উঠল রবিনের মুখ।

'হ্যাঁ, টাউন হলে রয়েছে সেগুলো, সম্ভবত। তবে এতক্ষণে সেটা বন্ধ হয়ে গেছে, ক্যানারিতে কাজ কম, তাই সরকারি নির্দেশে অনেক আগেই ছুটি হয়ে যায়', ক্যানি বললেন। 'টাউন ক্লার্কের নাম জুলিয়া রেনিন, হয়তো এখন কাপড় ধুয়ে রোদে শুকোতে দিচ্ছে।'

কথা বলতে বলতে শহর থেকে অনেক দূরে চলে এসেছে তিনজনে, ক্যাথেড্রাল ফরেস্টে যাওয়ার রাস্তাটা দিয়ে হাঁটছে এখন। 'মুসাকে আরেকটু পরে দেখতে

গেলেও চলবে', রবিনের দিকে তাকিয়ে বলল কিশোর। মস্ত পাইনের বনটা দেখাল। 'চলো, বনের ভেতর থেকে একটু ঘুরে আসি।'

রাস্তা থেকে নেমে বনতলে বিছানো পাইন নিডলের নরম কার্পেটে পা রাখল ওরা। 'সারা জীবনই এখানে এসেছি আমি, না এসে থাকতে পারি না', বিড়বিড় করলেন ক্যানি। মুখ তুলে চোখে মুগ্ধতা নিয়ে উঁচু উঁচু গাছগুলোর দিকে তাকালেন। 'এর চেয়ে সুন্দর ও ভালো জায়গা আর সারা দুনিয়ায় নেই, বুঝলে, পৃথিবীর কোথাও নেই।'

পাইনের গন্ধ মেশানো তাজা বাতাস বুক ভরে টেনে নিয়ে, ক্যানির কথার সমর্থনে মাথা ঝাঁকাল কিশোর।

'জায়গাটা এত শান্ত', আকাশের দিকে মুখ তুলল রবিন, 'সত্যিই খুব...'

কিন্তু বাক্যটা শেষ করতে পারল না। অদ্ভুত একটা শব্দ শুনে গলার ভেতরেই যেন কথাগুলো আটকে গেল তার। মুখ ফিরিয়ে দেখে, বাতাসে শিস কেটে সোজা তার দিকে ছুটে আসছে একটা তির।

নয়

চিৎকার দিয়ে ঝট করে মাথা সরিয়ে ফেলল রবিন। ওর গলার পাশ দিয়ে ছুটে গেল তিরটা। বাতাস লাগল গলায়। ঘ্যাঁচ করে গিয়ে একটা গাছে বিঁধল তিরটা। চোখের পলকে ঘটে গেল ঘটনাগুলো।

'আমাদের লক্ষ্য করে তির ছুড়ছে কে?' চেঁচিয়ে বলল ও।

হাঁটু গেড়ে বসে পড়েছে ততক্ষণে কিশোর আর ক্যানি। রবিনও বসে পড়ল। আরও তির আসার অপেক্ষা করছে। কয়েকটা মুহূর্ত নিথর হয়ে রইল বনভূমি। কিন্তু মাথার ওপর উঁচু গাছের ডালে বসা দু-একটা পাখির ডাক ছাড়া আর কোনো শব্দ শোনা গেল না।

'তিরটা কোনখান থেকে এসেছে, দেখা যাক', সাবধানে উঠে দাঁড়াল কিশোর। 'আমার ধারণা, বনে ঢোকার রাস্তায় দাঁড়িয়ে ছোড়া হয়েছে।' গাছপালার ফাঁক দিয়ে এঁকেবেঁকে দৌড় দিল ও। যতটা সম্ভব আড়ালে থাকার চেষ্টা করল।

'তোমাদের নিয়ে বনে ঢোকার সময় এ ধরনের ঘটনা ঘটবে কল্পনাও করিনি', ক্যানি বললেন। সাবধানে চারদিকে নজর রেখে বেরিয়ে এলেন কিশোর ও রবিনের পেছন পেছন।

'আমাদের খুন করতে চেয়েছিল কেউ', ক্যাপ্টেনকে বলল রবিন।

উদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে রবিনের দিকে তাকালেন ক্যাপ্টেন। আনমনে মাথা নাড়লেন। 'আমি জানি, এ দ্বীপে এখন সমস্যা শুরু হয়েছে, কিন্তু অবস্থা যে এতটা মারাত্মক, ভাবতে পারিনি।'

বনে ঢোকার প্রধান পায়েচলা পথটার দুই পাশে বুনো গোলাপ আর অন্যান্য গাছপালা। ওখানে এসে কিশোর বলল, 'কাউকেই তো চোখে পড়ছে না।' কোঁকড়া কালো চুলে আঙুল চালাল ও। চারপাশে তাকাতে লাগল।

বনের যে জায়গাটাতে দাঁড়িয়ে ছিল ও, সেদিকে তাকাল রবিন। গাছপালা কম ওখানে, কিছুটা ফাঁকা। তিরটা যেখানে গিয়ে বিঁধেছে, সে জায়গাটা লক্ষ করার পর পেছনে ঘুরল। একটা ঘন ঝোপ দেখে তার ভেতর ঢুকল। পরক্ষণে চেঁচিয়ে উঠল, 'এই দেখো দেখো!' নিচু হয়ে মাটি থেকে একটা ধনুক আর তিরভর্তি একটা তূণ তুলে নিল ও। 'দেখো, কী ফেলে গেছে!'

ঝোপের ভেতর ঢুকে ধনুক আর তিরগুলো পরীক্ষা করে দেখল কিশোর। পেশাদার শিকারিদের অস্ত্র এগুলো।

ঝোপ ঠেলে ক্যানিও এসে ঢুকলেন। নিচু হয়ে আরও একটা জিনিস তুলে নিলেন। 'এই তির ছোড়ার সঙ্গে এটার কোনো সম্পর্ক আছে কি না বুঝতে পারছি না।'

'কী?' দেখার জন্য এগিয়ে গেল কিশোর।

কাঠের তৈরি ছোট্ট একটা জিনিস দুই আঙুলে ধরে উঁচু করলেন ক্যানি। মেয়েদের চুলে পরার কাঁটা।

'ওটা আমি আগেও দেখেছি', চোখের পাতা সরু করে কিশোর বলল।

'পাল বার্জেনের চুলে পরা ছিল!' বলল রাবন।

'পলি বার্জেন? তির ছুড়েছে? মানুষ খুন করতে চেয়েছে?' বিশ্বাস করতে পারছেন না যেন ক্যানি। 'ওকে আমি বহু বছর ধরে চিনি, বুঝলে। ও এ কাজ করতে পারে না।'

ক্যানির হাতের চুলের কাঁটাটার দিকে তাকাল রবিন। 'কী জানি! কিন্তু ওর চুলের কাঁটা এই তিরগুলোর কাছে এল কী করে? কোনো কিছুই নিশ্চিত করে বলা যায় না, ক্যানি। বাইরে থেকে দেখে লোকের ভেতরটা বোঝা যায় না।'

'তা অবশ্য ঠিক', গম্ভীর স্বরে বললেন ক্যাপ্টেন। কিশোর ও রবিনের পেছনে তাকালেন। 'ওই যে, এসে গেছে। ওর কথা ওকেই জিজ্ঞেস করো।'

ঘুরে তাকাল কিশোর। পাহাড়ের চূড়া থেকে একটা রাস্তা নেমে চলে গেছে শহরের দিকে, সেটা ধরে নামতে দেখল পলি বার্জেন ও অ্যাকর্ন সোসাইটির দুই সদস্যকে।

নিঃশব্দে একসারিতে এগিয়ে চলেছে ওরা, কোনো কথা বলছে না। কিশোরদের কাটানোর সময় হাঁ হয়ে ঝুলে পড়ল কিশোরের চোয়াল। সবার হাতেই একটা করে তির আর লাল তিলওয়ালা লোকটার কাঁধে একটা শূন্য তূণ। ডাক দিল কিশোর, 'পলি, দাঁড়ান!'

ঘুরে তাকাল পলি। চোখে শীতল চাহনি। 'চেঁচাবে না, প্লিজ! এখানকার যারা বাসিন্দা, তাদের জীবনযাত্রায় বিরূপতা সৃষ্টি করবে।'

সরাসরি পলির চোখের দিকে তাকাল রবিন। 'রাখুন আপনার বিরূপতা। আগে বলুন, তির ছুড়ে আমার গলা ফুটো করে দিতে চেয়েছিলেন কেন?'

মৃদু মাথা নেড়ে করুণার ভঙ্গিতে রবিনের দিকে তাকাল পলি, যেন রবিন পাগল হয়ে গেছে। 'তুমি কী বলছ আমি কিছু বুঝতে পারছি না, ইয়াংম্যান, কিন্তু ক্যাথেড্রাল ফরেস্টে ঢুকে যদি কোনো বিপদে পড়ো, সেটা নিজের ভুলের কারণেই পড়বে। দেখা যাচ্ছে, তোমরা আমার কথায় কর্ণপাত করোনি। এখানকার বুনো জীবনের প্রতি কোনো গুরুত্বই দাওনি তোমরা। তবে মনে রেখো, মাই ফ্রেন্ড, শিওর থেকো, প্রকৃতির বিচার বলে একটা কথা আছে।'

'সেটা কী?' মাথার একপাশ চুলকাল রবিন।

'কসমিক জাস্টিস', পলি জবাব দিল। 'বলতে পারো, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বিচার।'

'পলি', ক্যানি বললেন, 'চীনারা যে হঠাৎ করেই অন্যায়ভাবে চা-পাতার দাম বাড়িয়ে দিল, তার বিচারটা কীভাবে হবে?'

'এই দুজনকে আমি সাবধান করে দিয়েছিলাম', ক্যানির কথায় কান দিল না পলি, 'দিনের এ সময়টায় যাতে ক্যাথেড্রাল ফরেস্টে না ঢোকে। বলে দিয়েছিলাম, তাতে ছোট ছোট বন্য প্রাণীর খাবারের রীতিতে বিঘ্ন সৃষ্টি হবে। ভেবেছিলাম, সামান্য হলেও শেখাতে পেরেছি ওদের, এখন তো দেখছি কিছুই পারিনি। আসলে, কিছু কিছু মানুষ আছে, একেবারেই শিখতে চায় না।'

'আর সেই রাগেতেই ওকে আপনি তির ছুড়ে মেরে ফেলতে চেয়েছিলেন?' কিশোর বলল।

'এক্সকিউজ মি, আমি কাউকে তির ছুড়িনি', পলি

বলল।

'তাই?' কঠোর দৃষ্টিতে পলির দিকে তাকাল রবিন। 'তাহলে এটার কী ব্যাখ্যা দেবেন?' চুলের কাঁটাটা উঁচু করে ধরল ও।

'আমার কাঁটা!' অবাক হলো পলি। 'সরাইখানায় হারিয়ে ফেলেছিলাম!' ছোঁ মেরে কাঁটাটা রবিনের হাত থেকে কেড়ে নিল ও।

'আরে দাঁড়ান দাঁড়ান, অত তাড়াহুড়ো করবেন না', আলতো করে কাঁটাটা আবার পলির হাত থেকে নিয়ে নিল কিশোর। 'আমাদের প্রমাণ দরকার।'

স্তব্ধ হয়ে গেল যেন পলি। 'কী বলছ তোমরা?'

'কী বলছি ঠিকই বুঝতে পারছেন', ফোঁস করে উঠল রবিন। 'আপনার মতো বুদ্ধিমান মহিলার এটা বুঝতে খুব বেশি সময় লাগার কথা নয়। আপনি আমাকে লক্ষ্য করে তির ছোড়েননি?'

'বিষয়টা খুব খারাপ হয়ে গেল, পলি', ক্যানি বললেন। 'তিরটা যখন ছোড়া হয়, আমিও এই ছেলেগুলোর সঙ্গে ছিলাম। তারপর ঝোপের ভেতর এই তূণের পাশে চুলের কাঁটাটা পেয়েছি।'

'ওটা আমার তূণ নয়', নাক সিঁটকাল পলি।

'শুনুন', বলল পলির পাশে দাঁড়ানো তিলওয়ালা লোকটা, 'আমি সারাক্ষণ পলির সঙ্গে ছিলাম। ওই তির ও ছোড়েনি।'

মাথা ঝাঁকাল পলি। 'অসহিংসতা আমাদের অ্যাকর্ন সোসাইটির প্রধান নিয়মগুলোর একটা।'

'তাহলে হাতে তির কেন আপনাদের?' কিশোর জিজ্ঞেস করল।

'বিশেষ অনুষ্ঠানে ব্যবহার করার জন্য', পলি বলল। 'প্রতিবছর পাহাড়ের চূড়া থেকে দড়ি বেয়ে নেমে সাগরে তির ছুড়ে ফেলি আমরা। তারপর অপেক্ষা করি, যতক্ষণ না ঢেউ সেই তিরগুলো আবার কিনারে

এনে ফেলে। এই কাঠন কাজের মধ্য দিয়ে আমাদের উদ্দেশ্য সফলের ক্ষেত্রে আমরা যে কতটা নিবেদিত, সেটা বোঝাতে চাই।'

'এটা দিয়ে আরও বোঝাতে চাই,' সুর মেলাল পলির পাশের লোকটা, 'আমাদের পরিশ্রম অবশ্যই সফলতা অর্জন করবে।'

'আপনাদের ধনুকটা কোথায়?' জানতে চাইল রবিন। 'যে ধনুক থেকে তিরটা ছোড়া হয়েছে, সেটাও আমরা পেয়েছি।'

ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলে মাথা ঝাঁকাল পলি। 'তোমরা বুঝতে পারছ না', ধৈর্য ধরে বোঝানোর চেষ্ট করল ও, 'আমরা তিরগুলোকে ভেঙে সাগরে ফেলে দিই আগ্রাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানোর জন্য।'

'সমস্যাটা হলো', পলির সঙ্গের আরেকজন মহিলা বলল, 'পাহাড়ের নিচের সৈকতে এখন লোক আছে, ওদের সঙ্গে যন্ত্রপাতিও আছে, তাই আজকে আর আমাদের অনুষ্ঠানটা করতে পারলাম না।'

এই কৈফিয়তে সন্তুষ্ট হতে পারল না রবিন।

'দেখুন, পলি', কিশোর বলল, 'ক্যানারিতে অসংখ্য বিপজ্জনক ঘটনা ঘটছে। দ্বীপের প্রায় সব মানুষকেই সরিয়ে দিতে চাইছে কেউ—ট্যুরিস্ট, আর্টিস্ট, এমনকি জেলেদেরও। আমরা জানি, আপনি এখানে মাছ ধরার বিরুদ্ধে। তাই আমরা মনে করছি, বাক উইনারের বোটের তলায় ফুটো করে দিয়ে বোটটা ডোবাতে চাওয়ার ব্যাপারে আপনার একটা মোটিভ আছে।'

'কেউ তা-ই করেছে নাকি? কী সাংঘাতিক!' আঁতকে উঠল পলি। 'যদিও বাকের এ রকম শাস্তিই হওয়া উচিত। মোটেও লোক ভালো নয় ও। সবাইকে বলে বেড়ায়, আমি নাকি পাগল। কিন্তু বেচারা মাছগুলোকে তাদের জায়গা থেকে টেনে তুলে খুন করছে ও-ই, আমি নই।'

এখানে সংঘটিত অন্য অপরাধগুলোর ব্যাপারেও হয়তো কিছু জানে পলি, ভাবল কিশোর। হয়তো কারও সঙ্গে যোগ দিয়ে কাজ করছে মহিলা, এমন কেউ, যে ভিন্ন কোনো কারণে দ্বীপবাসীকে অপছন্দ করে। বলল, 'মুলার্ট গ্যালারি থেকে কয়েকটা ছবি চুরি হয়েছে, কলি জেসনের আঁকা।'

পলির প্রতিক্রিয়া অবাক করল কিশোরকে। ওর মনে হলো, হাসি চাপতে চাইছে পলি। জিজ্ঞেস করল, 'আপনিও কলি জেসনের ভক্ত নাকি?'

'মোটেও না', পলি বলল। 'এই দ্বীপে বসে টাকা কামাই করে কাল, এত টাকা আর সম্পদের মালক হয়েছে, অথচ এখানকার বুনো প্রকৃতির জন্য কিছুই করেনি ও। বরং, ওদের ক্ষতি করেছে। গত শীতে, কয়েকটা বুড়ো পাইনের জটলাকে কেটে ফেলে দিয়েছে ও, যাতে ওর বাড়ি থেকে ভালোমতো সাগর দেখা যায়।'

'শুধু এই তির ছোড়াই নয়', বাধা দিয়ে রবিন বলল, 'আরও অনেক বিপজ্জনক ঘটনা ঘটেছে এখানে। গতরাতে বার্নার শ্যাকের চালা ধসে পড়েছিল আমাদের ওপর!'

রীতিমতো উদ্বিগ্ন মনে হলো পলিকে। জিজ্ঞেস করল, 'কেউ ইচ্ছে করে তোমাদের ক্ষতি করতে চাইছে না তো?'

'সেটাই জানতে চাই আমরা', পলির চোখের দিকে তাকিয়ে জবাব দিল রবিন। 'সরাইখানায় মাছের খাবারে বিষ মিশিয়ে দিয়ে মানুষের ক্ষতি করতে চেয়েছে সে। এ বিষয়ে আপনার কী মতামত, পলি?'

জ্বলে উঠল পলির চোখের তারা। 'আমি জানি, আমাকে ফাঁসানোর চেষ্টা চলছে। একটা কথা পরিষ্কার করেই বলতে চাই, আমি নিরপরাধ। যদি এ নিয়ে তোমরা আমাকে বিরক্ত করো, আমি আমার উকিলের সঙ্গে কথা বলব!' বলে, ঝটকা দিয়ে ঘুরে দাঁড়িয়ে দুই সঙ্গীকে নিয়ে হাঁটতে শুরু করল পলি। শহরের দিকে চলে গেল।

'বাপরেহ্!' ওদের দিকে তাকিয়ে থেকে ক্যানি বললেন। 'মেয়েটার ভেতরে আগুন আছে!'

'তবে কলি জেসনকে পছন্দ করে না, বোঝা গেছে', আনমনে বলল কিশোর। 'এটা আমাদের কাছে নতুন তথ্য।'

'প্রচুর উত্তেজনা গেল', ক্যানি বললেন। 'আমার মতো বুড়ো মানুষের জন্য অনেক বেশি। ঠিক আছে, ছেলেরা, এবার আমি যাই। আমার বুড়ি হয়তো এতক্ষণে দুশ্চিন্তা শুরু করে দিয়েছে, হয়তো ভাবছে, আবার আমি জাহাজে চড়ে মেইনল্যান্ডে চলে গেছি।'

রাস্তা ধরে হেঁটে যাচ্ছেন ক্যানি। সেদিকে তাকিয়ে রবিন বলল, 'কিশোর, পলি বলল পাহাড়ের নিচের সৈকতে যন্ত্রপাতি নিয়ে মানুষ এসেছে। কারা ওরা? রিক আর রিগার নয় তো?'

'জানার একটাই উপায়,' পাহাড়ের ওপরে উঠে যাওয়া রাস্তাটার দিকে তাকাল কিশোর। 'চলো, দেখে আসি।'

'কাল সন্ধ্যায় ডিনারের সময় নিরামিষের অর্ডার দিয়েছিল ওরা মনে আছে,?' হাঁটতে হাঁটতে রবিন বলল। 'অথচ ওরা কিন্তু মোটেও শুধু নিরামিষভোজী নয়। আগের দিন কাবাব আর ভেড়ার মাংস খেয়েছিল। মাছের মধ্যে স্যালমোনেলা আছে জেনেই হয়তো কাল মাছ খায়নি। বিষটা ওরা মেশায়নি তো?'

'আলামতগুলো অবশ্য ওদের প্রতি সন্দেহ বাড়ায়', জবাব দিল কিশোর। 'কিন্তু আমার প্রশ্ন, এসব কেন করবে ওরা? কী লাভ ওদের? তা ছাড়া গত বসন্তে যখন এই দ্বীপে সমস্যাগুলো শুরু হয়, তখন ওরা এখানে ছিলই না।'

'তা ঠিক', রবিন বলল। 'দ্বীপে যে ছিল না, এটা ভুলে গিয়েছিলাম।'

রাস্তার পাশে কলি জেসনকে দেখতে পেল ওরা। মহিলার বগলের নিচে একটা স্কেচ প্যাড। ওরা পাশ কাটানোর সময় জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকাল ওদের দিকে।

কলির কাছ থেকে দূরে এসে রবিন বলল, 'মনে হয় ছবি নষ্ট হওয়ার দুঃসংবাদটা পেয়ে গেছে মহিলা।'

পাহাড়ের চূড়ায় উঠল দুজনে। প্রবল বেগে বাতাস বইছে। কিনার দিয়ে সাবধানে উঁকি দিয়ে কিশোর বলল, 'কাউকে দেখতে পাচ্ছি না, তবে কিছু যন্ত্রপাতি পড়ে আছে। দেখতে যাবে নাকি?'

'আরে! এখানে দড়ি ফেলে গেল কে?' চূড়ার এক জায়গায় দুই বান্ডিল দড়ি দেখে বলল রবিন।

'নিশ্চয় পলিরা। ওদের অনুষ্ঠান করতে এসেছিল, পারেনি। হয়তো পরে আবার ফিরে আসার কথা ভেবে দড়িগুলো এখানেই ফেলে গেছে,' কিশোর বলল। 'আমাদের ভাগ্য ভালোই বলতে হবে, তাই না? পাহাড়ের কিনার বেয়ে নামার জন্য এগুলো ব্যবহার করতে পারব আমরা। দেয়ালটা খুব বেশি খাড়া নয়, দেখো, অনেকটাই ঢালু। দড়ি বেয়ে সহজেই নেমে যেতে পারব। তাতে সময় বাঁচবে। পাহাড় থেকে নেমে ঘুরে যাওয়ার চেয়ে সময় অনেক কম লাগবে।'

'দারুণ!' রবিন বলল। একটা বান্ডিল তুলে নিয়ে দড়ির এক মাথা নিজের কোমরে পেঁচিয়ে বাঁধল। আরেক মাথা কাছেরই একটা বড় গাছের সঙ্গে বেঁধে নেমে যেতে শুরু করল। কিশোরও একইভাবে দড়ি বেঁধে নামতে লাগল।

পাহাড়ের দেয়ালে অনেক পাথর রয়েছে। সেগুলোর কোনোটাতে পা রেখে, কোনোটা হাত দিয়ে ধরে নেমে চলল। বেশির ভাগটাতেই পা রাখার জায়গা পেল। তবে শেষদিকে এমন একটা জায়গায় এল, যেখানে একটা বড় শিলাখণ্ড অনেকটা তাকের মতো বেরিয়ে আছে পাহাড়ের গা থেকে। তাকের কিনার দিয়ে ঝুলে রয়েছে দড়ি।

'এখান থেকে আর কোনো কিছু ধরতে পারব না', কিশোর বলল। 'পুরোই ঝুলে ঝুলে নামতে হবে।'

হঠাৎ ঝাঁকি দিয়ে দড়িটা নেমে এল আধা ইঞ্চি। 'এই!' চেঁচিয়ে উঠল ও, ধড়াস করে এক লাফ মারল হৃৎপিণ্ডটা। 'কী হলো...?'

ওর কথা শেষ হওয়ার আগেই মাথার ওপর পটপট করে দড়ি ছেঁড়ার শব্দ হলো। পুরোপুরি ঢিলা হয়ে গেল দড়িটা। চিৎকার করে কিশোর বলল, 'রবিন, আমি পড়ে যাচ্ছি!'

দশ

'কিশোর! কিশোর!' রবিনের চিৎকার কানে এল কিশোরের।

নিচে পড়ছে ও। ভয়ংকর একটা মুহূর্ত। আচমকা থাবা মারল। হাতে যা ঠেকল তা-ই ধরে পতন রোধ করার চেষ্টা করল। রুক্ষ একটা জিনিস ধরেছে। হাতের তালু কেটে গেল। তবে মোটামুটি শক্ত। পতন ঠেকাল।

ওপর দিকে তাকাল কিশোর। দেয়ালের ফাটলে জন্মে থাকা একটা গাছ ধরেছে। এ রকম জায়গায় এভাবে গাছ জন্মানোটা অসম্ভবই মনে হয়। তবু জন্মেছে, আর সেটা ধরেই প্রাণপণে ঝুলে রইল ও। মনে মনে দোয়া চাইতে লাগল, গাছটা যাতে না ভাঙে, কিংবা উপড়ে না আসে।

'ধরে রাখো, কিশোর!' ওপর থেকে বলল রবিন। 'আমি আসছি...আরে!' বলে চিৎকার করে উঠল। ওপরে তাকিয়ে কিশোর দেখল, রবিনের দড়িটা হড়াৎ করে ফুট খানেক নেমে চলে এসেছে। চেঁচিয়ে বলল রবিন, 'আমার দড়ি!'

'কেউ কেটে দিয়েছে, আমারটার মতো!' ঝুলে থেকে জবাব দিল কিশোর। 'জলদি কিছু ধরার চেষ্টা করো! আমাকে নিয়ে ভেবো না!'

'কিন্তু তুমি পড়ে যাবে!' আবার চেঁচিয়ে বলল রবিন। 'আমি তোমাকে...!' দড়ির আরেকটা পাক কেটে যেতে থেমে গেল ও। তাকের মতো বেরিয়ে থাকা পাথরটার কিনার ধরে ঝুলে পড়ল। ওপর থেকে দড়ির কাটা মাথাটা সাপের লেজের মতো নাচতে নাচতে নিচে নেমে এল। ওটার বাড়ি থেকে বাঁচার জন্য মাথা সরাতে গিয়ে আরেকটু হলে হাত থেকে পাথরটা ছুটে যাচ্ছিল রবিনের। দড়ির কাটা মাথাটা ওর কাঁধে পড়ে আটকে রইল।

'বাহ্, এতক্ষণে ষোলকলা পূর্ণ হলো!' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল রবিন। 'এখন কী করব?'

নিচে তাকাল কিশোর। কোনোমতে পা রাখার মতো একটা জায়গা দেখতে পেল। তারপর যে গাছটা ধরে ঝুলে রয়েছে, সেটার দিকে তাকাল। গোড়া থেকে মাথা পর্যন্ত ফুট চারেক লম্বা হবে। ছোট গাছ, কিন্তু শিকড়গুলো খুব শক্তভাবে ফাটল কামড়ে রয়েছে। অক্টোপাসের পায়ের মতো হয়ে কোথাও পাথর আঁকড়ে ধরেছে, কোথাও বা পাথরের ফাঁক দিয়ে মাটিতে ঢুকে গেছে।

'তোমার দড়ির মাথাটা আমার কাছে ছুড়ে দিতে পারবে?' কিশোর বলল। 'গাছের শিকড়ে মাথাটা পেঁচিয়ে বাঁধতে পারলে দড়ি বেয়ে নেমে যেতে পারব।'

'মাথা খারাপ নাকি?' রবিন বলল। 'এত ছোট একটা গাছ কোনোমতেই আমাদের দুজনের ভার বইতে পারবে না।'

'এ ছাড়া আর কোনো উপায় আছে?' কিশোর বলল। 'তাড়াতাড়ি করো। অনন্তকাল এভাবে গাছ ধরে ঝুলে থাকতে পারব না।'

প্রথমে পা রাখার মতো একটা পাথর খুঁজল রবিন। সেটা পেয়ে গিয়ে এক হাতে তাকের মতো পাথরটার কিনার খামচে ধরে আরেক হাতে দড়িটা ছুড়ে দিল কিশোরের দিকে। দড়ির অন্য মাথাটা এখনো বাঁধা রয়েছে কোমরে।

এক হাতে দড়ির মাথাটা লুফে নিল কিশোর। অন্য হাতে গাছ ধরে ঝুলে থেকে গাছের গোড়ায় দড়ির কাটা মাথাটা পেঁচাতে লাগল। পেঁচানোর পর গিঁট দিল। 'হয়েছে, রবিন। হাত ছাড়তে তৈরি হও।'

'সত্যি? গাছটা দুজনের ভার বইতে পারবে?' রবিনের কণ্ঠে অস্বস্তি।

'আশা তো করি', জবাব দিল কিশোর। 'নাও, এবার খানিকটা টারজানের খেলা দেখাও তো দেখি। দেরি কোরো না।'

'বেশ', জবাব দিল রবিন। ভারী দম নিয়ে পাথর ছেড়ে দিল। তীব্র গতিতে নিচে পড়তে শুরু করল। প্রায় ২৫ গজ মতো পড়ার পর শেষ হলো দড়িটা, হ্যাঁচকা টান লাগল কোমরে, ঝাঁকি খেয়ে থামল দেহটা, ঝুলতে লাগল পাহাড়ের গোড়ার মাটি থেকে মাত্র পাঁচ ফুট ওপরে। প্রচণ্ড ঝাঁকি লাগল ছোট গাছটায়, তবে শিকড় উপড়াল না।

'এবার তোমার কোমর থেকে দড়ি খুলে নাও!' ওপর থেকে চেঁচিয়ে বলল কিশোর।

গিঁট খুলে নিয়ে মাটিতে লাফিয়ে পড়ল রবিন। নিরাপদে।

'ইয়াহু!' বলে দুই হাত ওপর দিকে তুলে ঝাঁকাল রবিন। 'কিশোর, এবার তোমার পালা! নেমে এসো দড়ি বেয়ে!'

'আসছি।' গাছ ছেড়ে দিয়ে দড়ি ধরে ঝুলে পড়ল কিশোর। সেটা বেয়ে ধীরে ধীরে নিচে নামতে শুরু করল। মাটি থেকে পাঁচ ফুট ওপরে থাকতে ওকে ধরে ফেলল রবিন, নামতে সাহায্য করল।

'কী, কেমন লাগল পাহাড় থেকে নামা?' নিরাপদ জায়গায় দাঁড়িয়ে বলল রবিন। 'ভিডিও ক্যামেরায় দৃশ্যটা ধরে রাখতে পারলে ন্যাশনাল জিওগ্রাফির কাছে বেচতে পারতাম।'

প্রচণ্ড স্বস্তিতে হাসতে লাগল কিশোর। তারপর মুখ তুলে পাহাড়চূড়ার দিকে তাকাল। এমনভাবে বেঁকে গেছে, ভালোমতো দেখা যায় না। হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেল ও। 'কথাটা হলো, রবিন, আমাদের দড়িগুলো কেউ কেটে দিয়েছে।'

'আমরা যে ওখানে গিয়েছি, সেটা জানে কে?' রবিনের প্রশ্ন।

'ক্যানি আর পলি বাদে?' চিন্তিত ভঙ্গিতে বলল কিশোর। 'ইয়ে, কলি জেসন জানে।'

'পলি দৌড়ে ফিরে এসে আমাদের অনুসরণ করে থাকতে পারে', রবিন বলল। 'আর বুস্টার? এসবের মধ্যে ওরও হাত থাকতে পারে। এ দ্বীপটা ওর অতি পরিচিত। আমাদের অনুসরণ করার জন্য ওর কোনো রাস্তা দিয়ে আসার দরকার নেই।'

'তা ঠিক', কিশোর বলল।

বালিতে ঢাকা মাটির দিকে তাকাল রবিন। বলল, 'কেউ ছবি তুলেছে এখানে দাঁড়িয়ে।'

চারপাশে তাকাল কিশোর। ছোট ছোট গর্তে জোয়ারের পানি জমে রয়েছে। সেগুলোতে রয়েছে প্রচুর তারামাছ আর শামুক। 'ছবি তোলার কোনো যন্ত্রপাতি তো দেখতে পাচ্ছি না।'

'এগুলো দেখো', মাটির দিকে আঙুল তুলে তিনটে দাগ দেখাল রবিন। 'ট্রাইপডের পায়ের দাগ, এখানে বসানো হয়েছিল। রিক আর রিগারকে ঠিক এখানেই দেখেছিলাম সেদিন। ছবি তোলার অতি চমৎকার জায়গা। কিন্তু অবিকল একই জায়গায়, একই দিক করে কিসের ছবি তুলেছে?'

'আর, সাগর তো রয়েছে পেছন দিকে—সেটার ছবি না তুলে পাথরের দেয়ালের একই ছবি বারবার তোলার অর্থটা কী?' নিজেকেই যেন প্রশ্ন করল কিশোর। 'তবে, একটা ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই, সেটা হলো, আবারও স্যালমোনেলা মেশানো হোক বা না হোক, আজ রাতে আবার আমাদের সরাইখানায় ডিনার খেতে যেতে হবে। রিক আর রিগারের সঙ্গে দেখা করতে হবে। কী বলছি, আশা করি বুঝতে পারছ।'

'তা পারছি', কিশোরের কাঁধে হাত রাখল রবিন।

ফিরে চলল দুজনে। মুসার কী অবস্থা, দেখা দরকার। সকালে বেরোনোর পর থেকে যা যা ঘটেছে, সেটাও ওকে জানাতে হবে। এমিলির বাড়িতে এসে অবাক হয়ে দেখল ওরা, বারান্দায় ইজেল রেখে নিচের

শহর আর তার কিনারে সাগরের একটা নকশা আঁকছে মুসা। আঁকা প্রায় শেষ করে এনেছে।

'বাহ্, ভালো এঁকেছ তো', প্রশংসা করল রবিন। 'তোমার মধ্যে যে ছবি আঁকার মেধা রয়েছে, তা তো জানতাম না।'

'আমি নিজেই জানতাম না', নিজের কাজে নিজেই গর্বিত মুসা। 'মনে হচ্ছে ক্যানারি দ্বীপটা সবাইকেই ছবি আঁকার প্রেরণা জোগায়।'

সারা দিনের ঘটনাগুলো মুসাকে জানাল কিশোর ও রবিন। পাহাড়ের ঢাল বেয়ে নামার ওদের কী ভয়াবহ বিপদ ঘটেছিল, সেটা বর্ণনার সময় আতঙ্কিত হয়ে পাশেই রাখা একটা বেতের চেয়ারে ধপ করে বসে পড়ল মুসা। বিন্দু বিন্দু ঘাম জমল কপালে। হাত দিয়ে মুছে বলল, 'শুনেই জান ধড়ফড় করছে আমার!'

'তবে এত উত্তেজনা আমার খিদে বাড়িয়ে দিয়েছে', রবিন বলল। 'শহরে যাওয়া দরকার, খেতে হবে।'

'আমাদের প্রতিবেশী, মিসেস রেনিন, আজ রাতে আমাকে তাঁর বাড়িতে খাওয়ার দাওয়াত দিয়েছেন', মুসা বলল। 'আমি জানি, তোমরা তাতে কিছু মনে করবে না, তাই "যাব" বলে দিয়েছি।'

'আমাদের মনে করার কী আছে?' রবিন জিজ্ঞেস করল।

'মিসেস রেনিন।' কী যেন ভাবছে কিশোর। হঠাৎ প্রশ্ন করল, 'মুসা, মিসেস রেনিনের পুরো নামটা কী?'

'জুলিয়া রেনিন।'

'ঠিক এটাই ভাবছিলাম! জুলিয়া রেনিন!' জোরে বলল কিশোর। 'টাউন হলে কাজ করেন, তাই না?'

'মনে হয়', জবাব দিল মুসা।

'তাঁর কথা ক্যানি আমাদের বলেছেন', কিশোর বলল। 'তাঁকে কয়েকটা প্রশ্ন করতে চাই, কিছু মনে করবেন না তো?'

'তা করবেন না', মুসা বলল। 'রেনিনরা খুব ভালো মানুষ।'

'চলো তাহলে', বলেই ঘুরে দাঁড়িয়ে বারান্দা থেকে নেমে পড়ল কিশোর। রাস্তা ধরে এগিয়ে চলল মিসেস রেনিনের বাড়ির দিকে। রবিন আর মুসাও চলল তার পেছন পেছন।

দরজায় টোকা দিল কিশোর। দরজা খুলে দিয়ে হাসিমুখে স্বাগত জানালেন মিসেস রেনিন, 'ও, তোমরা। মুসা, তুমি তো বলোনি তোমার বন্ধুদের নিয়ে আসবে।'

'আমরা খেতে আসিনি, মিসেস রেনিন', রবিন বলল।

'খেতে আসোনি মানে? প্রচুর খাবার আছে আমার ঘরে', মিষ্টি হাসি দিয়ে বললেন মিসেস রেনিন। 'টেবিলে শুধু দুটো বাড়তি প্লেট রাখতে হবে।'

'না, সত্যি আমরা খাব না', কিশোর বলল। 'আমাদের আরেক জায়গায় যেতে হবে। আপনাকে শুধু কয়েকটা কথা জিজ্ঞেস করতে এলাম। বুস্টার মরিসন আর তার পরিবার সম্পর্কে।'

'দ্বীপের বর্তমান সমস্যাগুলোর সমাধান করতে চাইছে কিশোর আর রবিন', মুসা জানাল।

ওদের ভেতরে নিয়ে গেলেন মিসেস রেনিন।

'শুনলাম, জমির ট্যাক্স নিয়ে নাকি ঝামেলা হয়েছিল বুস্টারের মা মিসেস জনসনের', কিশোর বলল। 'এ বিষয়ে আপনি কিছু জানেন নাকি?'

'এর সঙ্গে দ্বীপের সমস্যা সমাধানের কী সম্পর্ক?' জিজ্ঞেস করলেন মিসেস রেনিন।

'এ মুহূর্তে সেটার জবাব আমার জানা নেই', কিশোর বলল। 'তবে মনে হচ্ছে, এর সঙ্গে কোথাও কোনো সম্পর্ক আছে।'

'ওরা যে এখনো বেঁচে আছে, সেটা ওদের ভাগ্য', মুসা বলল। 'শয়তানিগুলো যে করছে, সে প্রচণ্ড ভয় পেয়ে গেছে, তার ধারণা, খুব শিগগিরই রহস্যের সমাধান করে ফেলবে ওরা, তাই ওদের সরিয়ে দিতে চাইছে।' পুরোনো বাড়ির ছাদ ধসিয়ে দেওয়া, দড়ি কেটে পাহাড় থেকে ফেলে দিতে চাওয়ার কথা বিস্তারিত মিসেস রেনিনকে জানাল ও।

'লোকটা ভীষণ বিপজ্জনক, মিসেস রেনিন', কিশোর বলল। 'তাকে ধরার জন্য ছোটখাটো সব তথ্যই আমাদের জানা দরকার।'

'হুঁ, বুঝলাম', উদ্বিগ্ন ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকালেন মিসেস রেনিন। 'আমি যা যা জানি, সবই বলব তোমাদের। তবে টাকার অঙ্কটা না দেখে সঠিক বলতে পারব না। বেশ কিছু টাকা ট্যাক্স জমে গেছে বুস্টারের মায়ের। আর সম্ভবত আগামী মাসেই সেটা দিতে হবে।'

'জমির পরিমাণ কতখানি?' জানতে চাইল রবিন।

'দাঁড়াও, ম্যাপ দেখিয়ে বলি।' বইয়ের আলমারি থেকে একটা বড় ম্যাপ বের করলেন মিসেস রেনিন। ভাঁজ খুলে একটা কফি টেবিলের ওপর সেটা বিছালেন। 'মরিসনের জমি দুই ভাগে বিভক্ত, এই যে, দেখো। বুস্টারদের বাড়িটা হলো এখানে। আর দ্বিতীয়টা এই যে এখানে, দ্বীপের বসতিহীন জায়গা এটা, পাহাড়ের কাছে।' ম্যাপের বেশ বড় একটা ত্রিভুজের ওপর আঙুল রাখলেন তিনি।

'ওরিব্বাবা!' বলে উঠল বিস্মিত রবিন। 'এত্ত বড়! তার মানে তো পাহাড়সহ পুরো ক্যাথেড্রাল ফরেস্টেরই মালিক ওরা।'

'হ্যাঁ, তাই তো', মিসেস রেনিন বললেন। 'যদিও এই জায়গাটা দ্বীপের ল্যান্ড অ্যাগ্রিমেন্টের মধ্যে পড়ে—তাতে বলা হয়েছে, ওখানে কোনো ধরনের উন্নয়ন করা যাবে না, তবু বুস্টার এর ট্যাক্স দিয়ে যাচ্ছে।'

'উন্নয়ন হয়নি, এমন আর কোনো জায়গা আছে, যেটার মালিক অন্য কেউ?' কৌতূহলী হয়ে জানতে চাইল কিশোর।

'দুজন, সমান সমান মালিক, মিস্টার অ্যারন গিলবার্ট আর বাক উইনার', মিসেস রেনিন জানালেন। 'আরও কয়েকজন মালিক আছে, খুব ছোট ছোট জায়গার, তবে উল্লেখযোগ্য তেমন কিছু না।'

'কিশোর', একটা টেবিলে রাখা ছোট একটা ঘড়ির দিকে চোখ পড়তে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল রবিন, 'সরাইখানায় যেতে হবে। আগেভাগেই ওখানে যাওয়ার কথা আমাদের, ভুলে গেছ?'

'হ্যাঁ, যাব', রবিনকে বলে আবার মিসেস রেনিনের দিকে তাকাল কিশোর। 'আর মাত্র একটা প্রশ্ন, মিসেস রেনিন, বুস্টার যদি সময়মতো টাকাটা পরিশোধ করতে না পারে, কী ঘটবে?'

'জায়গাটা নিলামে উঠবে', মিসেস রেনিন বললেন, 'ট্যাক্স শোধ করার জন্য সাধারণত সবখানেই যা হয়ে থাকে। তবে আমাদের এখানে একটা সমস্যা আছে, নিলামে যে-ই জায়গাটা কিনুক, ল্যান্ড অ্যাগ্রিমেন্ট অনুযায়ী ওখানে কোনো ধরনের উন্নয়ন করতে পারবে না। আর এ ধরনের শর্ত নিয়ে খুব বেশি লোকে জায়গা কিনতে রাজি হবে না।'

'বুঝলাম।' চিন্তিত ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকিয়ে উঠে দাঁড়াল কিশোর। দরজার দিকে এগোল। বেরোনোর আগে ফিরে তাকিয়ে বলল, 'মিসেস রেনিন, যদি কিছু মনে না করেন তো আমি আবার আসব আপনার সঙ্গে কথা বলার জন্য। অনেক মূল্যবান তথ্য জানালেন। থ্যাংকস।' মুসার দিকে তাকিয়ে বলল ও, 'মুসা, গেলাম। রাতে দেখা হবে।'

রাস্তা দিয়ে প্রায় দৌড়ে চলল দুই গোয়েন্দা, সরাইখানার দিকে।

'এখন বুঝলাম, টাকার জন্য এমন খেপে উঠেছে কেন বুস্টার', রবিন বলল।

'হ্যাঁ।' জবাব দিল কিশোর। 'তবে ও এখানে এত বড় একটা জায়গার মালিক, সেটা ভাবলেও অবাক লাগে, তাই না? ওর আচরণে কিন্তু মোটেও তা মনে হয় না।'

'হয়তো জায়গাটা ধরে রাখতে পারবে না, এই ভয়েই এমন করে', পকেটে হাত ঢুকিয়ে রেখেছে রবিন। ভাবছে।

সময়মতোই সরাইখানায় পৌঁছাল ওরা। ভেতরে ঢুকতেই ডিনার দেওয়ার ঘণ্টা বাজল। লবিতে দেখতে পেল টনিকে। অতিথিদের রেজিস্টার খাতা দেখছে। আজ আর ক্যানারি ইনের স্বাভাবিক পোশাক, অর্থাৎ টি-শার্ট নেই গায়ে। ওর দিকে হাত নেড়ে 'হাই' বলল কিশোর। মুখ তুলে হেসে ওদের স্বাগত জানাল টনি।

'কি, ডাইনিংরুমে ডিউটি নেই আজ তোমার?' রবিন জিজ্ঞেস করল।

'মিস্টার বেরিংকে এই খামটা দিতে হবে, তাই রেজিস্ট্রি খাতায় তাঁর ঘরের নম্বর দেখছি', জবাব দিল টনি। 'দিয়ে এসে তারপর পোশাক পরব।'

'কোথায় পেলে এটা?' জানতে চাইল কিশোর।

'সেটাই তো আশ্চর্য লাগছে', টনি বলল। 'ডাইনিংরুমে ন্যাপকিন রাখতে গিয়েছিলাম, দেখি একটা টেবিলে এসে গ্লাসচাপা দিয়ে রাখা হয়েছে এই খামটা। মিস্টার বেরিংকে পৌঁছে দেওয়ার কথা লেখা রয়েছে।'

'আমরা রিক বেরিংয়ের ঘরেই যাচ্ছি, তাঁর সঙ্গে জরুরি কথা আছে।' হাত বাড়াল রবিন, 'আমাদের দাও। আমরাই দিয়ে আসতে পারব, তোমার আর যাওয়া লাগবে না।'

খুশি হয়েই খামটা রবিনকে দিল টনি। 'বাঁচালে! এমনিতেই আমার দেরি হয়ে গেছে আজকে।'

সিঁড়ির ল্যান্ডিংয়ে পৌঁছে খামটা খুলল রবিন, যেখানে কেউ নেই। খামের মুখের আঠা ভালোমতো লাগেনি, বোধহয় সাগরের ভেজা আবহাওয়ার কারণেই। তাতে খুশিই হলো দুই গোয়েন্দা। ভেতর থেকে একটা টাইপ করা নোট বেরোল। পড়ার জন্য ঝুঁকে এল দুজনে। লেখা রয়েছে: 'দুই গোয়েন্দা কিশোর ও রবিন আমার জীবন বিষয়ে তুলেছে। টাউন হলের পেছনের মাঠে রাত দশটায় দেখা কোরো। রিগারকে সঙ্গে এনো।'

'যাক, অবশেষে!' রবিনের দিকে তাকিয়ে হাসল কিশোর। 'কেস সমাধানের একটা সত্যিকার সূত্র পাওয়া গেল।'

মাথা ঝাঁকাল রবিন। 'আজ রাতে কোথায় যেতে হবে আমাদের, বুঝতে পারলাম।'

'আরে দাঁড়াও দাঁড়াও', কিশোর বলল। 'তারচেয়ে ভালো বুদ্ধি এসেছে আমার মাথায়। মাঠে আমি একাই যাই না কেন? রাতে ওরা যখন বেরিয়ে যাবে, তুমি বরং ওই দুজনের ঘর আরেকবার ভালোমতো খুঁজে দেখো, প্রচুর সময় পাবে। ওরা যখন ফিরে আসবে, ওদের আগেই আমি এসে তোমাকে সাবধান করে দেব।'

'ভালো বুদ্ধি', রবিন বলল।

নোটটা আবার খামে ভরে, খামের মুখ আটকে, খামটা রিক ঘরের দরজার তলা দিয়ে ভেতরে ঠেলে দিল ও। ফিসফিস করে কিশোরকে বলল, 'চলো!'

সিঁড়ি বেয়ে প্রায় দৌড়ে নিচে নামল দুজনে। ডাইনিংরুমে ঢুকে রিক আর রিগারের সঙ্গে এক টেবিলে বসল ওরা। কিন্তু আলাপ জমাতে পারল না। কথাই প্রায় বলতে চাইল না রিক ও রিগার। ছবি তোলার কথা তুলল কিশোর। ওরা তাতে যোগ দিল না। সাগর সৈকতে ট্রাইপড বসানোর কথা বলে সেটার বিষয়ে আলোচনা করতে চাইল। তাতেও বিশেষ সাড়া দিল না রিক ও রিগার।

তাড়াহুড়ো করে খাওয়া শেষ করে উঠে পড়ল দুজনে। সাতটা পঁয়তাল্লিশ মিনিট বাজে তখন। ওদের দরজার দিকে যেতে দেখে আপনমনে বিড়বিড় করে কিশোর বলল, 'রাতে তোমাদের সঙ্গে মাঠে অবশ্যই দেখা হবে আবার।' মুচকি হাসল রবিন।

সন্ধ্যাটা সরাইখানার টিনএজ কর্মচারীদের সঙ্গে কাটাল দুজনে। লনে ফ্রিসবি খেলল। সূর্য ডুবল। অন্ধকার নামতেই খেলা বন্ধ করে দিতে হলো। কর্মচারীরা সবাই সরাইখানার ভেতরে চলে গেল আগুনের পাশে বসে গান-বাজনা করার জন্য। বারান্দায় বসে রইল কিশোর ও রবিন, রাত দশটা বাজার অপেক্ষায়।

'আজ রাতেই এই কেসটার শেষ দেখতে চাই', উত্তেজিত কণ্ঠে রবিন বলল। 'রিক আর রিগার কার সঙ্গে দেখা করে, কী কথা বলে, জানার জন্য অস্থির হয়ে আছি আমি।'

'আমি জানার সঙ্গে সঙ্গে জানাব তোমাকে', কিশোর বলল। 'রিক আর রিগারের ঘরে কী পাওয়া যায়, সেটা জানাও জরুরি।'

'তুমি ফিরে আসার আগেই যদি আমি জেনে যাই', রবিন বলল, 'সোজা মাঠে চলে যাব, তোমাকে উদ্ধার করতে।'

'আসলে বলতে চাও, দেখা করার জন্য', শুধরে দিল কিশোর। 'আমাকে উদ্ধার করার প্রয়োজন হবে না।'

'আস্তে বলো! ওরা আসছে!' সাবধান করল রবিন।

বারান্দার এক মাথায় চলে এল দুজনে। এখান থেকে বারান্দাটা মোড় নিয়ে ঘুরে গেছে। লুকিয়ে থেকে দেখল, হোটেল থেকে বেরিয়ে রাস্তায় নামল রিক ও

রিগার। আস্তে করে কিশোরের পিঠে চাপড় দিয়ে ভেতরে চলে গেল রবিন। অন্ধকারে বারান্দা থেকে নেমে নিরাপদ দূরত্ব রেখে রিগারদের পিছু নিল কিশোর।

রবিনসন রোডের মোড় থেকে মিউনিসিপ্যাল বিল্ডিংয়ের দিকে ঘুরল রিক ও রিগার। বাড়িটার পেছনের মাঠের দিকে এগোল। এ সময় পাহাড়ের মাথা থেকে শোনা গেল ফগহর্ন। মুখ তুলে আকাশের দিকে তাকাল কিশোর। মেঘ জমে তারা ঢেকে দিয়েছে। লাইট হাউস আর রিক ও রিগারের টর্চের আলো ছাড়া আর কোথাও কোনো আলো নেই।

হঠাৎ পেছনে খসখস শব্দ শোনা গেল। বরফের মতো জমে গেল যেন কিশোর। ঘুরে তাকাতে যাবে, এ সময় ওর মুখ চেপে ধরল শক্ত একটা হাত। নাকে চেপে ধরল রুমাল।

মিষ্টি একটা কটু গন্ধ নাকে ঢুকল কিশোরের। ছটফট করে নিজেকে ছাড়ানোর ব্যর্থ চেষ্টা করল ও। চোখের সামনে ঘনিয়ে এল ঘন অন্ধকার।

এগারো

পা টিপে টিপে নিঃশব্দে দোতলার বারান্দায় উঠল রবিন। ২২১ নম্বর ঘরের সামনে থামল। অন্য ঘরগুলোর পাশ কাটানোর সময় ভেতর থেকে কথাবার্তা, শাওয়ারের শব্দ কানে এল। একটা ঘরের কাছ দিয়ে আসার সময় নাক ডাকার শব্দও শুনতে পেল। ক্যানারির মতো একটা বিদ্যুৎবিহীন অন্ধকার দ্বীপে লোকে বেশি রাত করে না, সকাল সকাল শুয়ে পড়ে, সূর্য ওঠার সময় উঠে পড়ে।

পকেট থেকে একটা আর্মি সুইস নাইফ বের করল রবিন। ফলাটা খুলল। কাঁধের ওপর দিয়ে ফিরে তাকিয়ে দেখল কেউ আসছে কি না। তারপর ছুরির ফলাটা ঢুকিয়ে দিল দরজার ফ্রেম আর পাল্লার মাঝখানের ফাঁকে। পুরোনো আমলের তালার হুড়কোটা খুলতে সময় লাগল না।

খুলে গেল দরজা। ভেতরে ঢুকে পড়ল ও। অন্ধকার ঘর। পকেট থেকে পেনলাইট বের করে জ্বালল। খুঁজতে শুরু করল ঘরটায়। সূত্র আছে কি না দেখার জন্য প্রথমে ল্যাপটপ কম্পিউটারটা অন করতে চাইল। কিন্তু থেমে গেল যখন খোলার আগে পাসওয়ার্ড চাইল কম্পিউটার।

এরপর লেজার বুকটা পরীক্ষা করল ও। কিন্তু কিশোর যা পেয়েছিল, তার বাইরে নতুন কোনো তথ্য পেল না।

পাহাড়ের গোড়ায় যে ট্রাইপডটা দেখেছিল, সেটা দাঁড় করানো রয়েছে ঘরের এক কোণে, ক্যামেরাটা লাগানোই আছে। কিন্তু কাছে থেকে ভালোমতো দেখে রবিন বুঝতে পারল, ওটা ক্যামেরা নয়, এক ধরনের টেলিস্কোপের মতো যন্ত্র, যা দিয়ে ভূমি জরিপ করা হয়। আশ্চর্য তো! রিক বেরিং আর রিগার জোনস তাদের অবকাশের সময়টা জমি মেপে কাটাচ্ছে কেন? ভেবে কিছু বুঝতে পারল না।

হাঁটু গেড়ে বসে, পেনলাইটের আলোয় বিছানার নিচে উঁকি দিল ও। যা দেখল, তাতে উৎসাহ বাড়ল ওর। বাথরুমের টিস্যু পেপারের মতো গোটানো একটা কাগজের স্ক্রোল মেঝেতে পড়ে আছে, ছুটি কাটাতে আসার সময় লোকে যা সাধারণত আনে না।

স্ক্রোলটা বের করে এনে বিছানায় রেখে খুলল ও। গোটানো কাগজটাতে আলো ফেলে দেখতে লাগল ও। কাগজের শুরুতে একেবারে মাথার কাছের লেখাটা পড়েই শিস দিয়ে উঠল। লেখা রয়েছে: ক্যানারি আইল্যান্ড সুপার রিজোর্ট, স্টেজ ওয়ান প্রোজেকশন।

স্ক্রোলটাতে আসলে ক্যানারি আইল্যান্ডের একটা ম্যাপ আঁকা রয়েছে। কিন্তু এই ক্যানারি দ্বীপ রবিনের অচেনা। হাতে আঁকা যে ম্যাপের কপি রয়েছে ওদের কাছে, সেটার সঙ্গে এর কোনো মিল নেই, মিল নেই এমনকি জুলিয়া রেনিনের ম্যাপটার সঙ্গেও। এটা এমন এক ক্যানারি আইল্যান্ড, যেটা বাস্তবে নেই, অন্তত এখনো তৈরি হয়নি।

বুকের মধ্যে হৃৎপিণ্ডটা হাতুড়ি পেটাচ্ছে যেন ওর, উত্তেজনায়, ম্যাপটার দিকে তাকিয়ে থেকে বুঝতে পারছে অত্যন্ত জরুরি একটা সূত্র পেয়ে গেছে। এটা একটা অত্যাধুনিক, ত্রিমাত্রিক, কম্পিউটারে করা টপগ্র্যাফিক্যাল ম্যাপ। এই ম্যাপে রয়েছে মস্ত একটা বন্দর—যেটা তৈরি করা হবে শিপরেকের কাছে, ডজনখানেরক টেনিস কোর্ট আর বিশাল এক নোনা পানির পুল, যেটা বর্তমানে সবুজ ঘাসের মাঠ। ক্যানারি ইনের জায়গায় গড়ে তোলা হবে বারো তলা একটা হোটেল, লাইট হাউসের আকৃতিতে, বিল্ডিংটা হবে ষড়ভুজ। ছাদে থাকবে রেস্টুরেন্ট, লাইট হাউসের ওপরে যেমন সার্চলাইট ঘোরে, তেমনিভাবে সারাক্ষণ ঘুরতে থাকবে রেস্টুরেন্টের মস্ত ঘরটা। হোটেলটার নাম দেওয়া হবে 'ক্যানারি প্যালেস'।

দ্বীপের অন্য প্রান্তে ক্যাথেড্রাল ফরেস্টসহ পাহাড়ের ঢালটাকে নিয়ে তৈরি করা হবে বিশাল গল্‌ফ কোর্স। 'এ কারণেই পাহাড়ের গোড়ায় সেদিন ট্রাইপড বসিয়ে জায়গা জরিপ করছিল লোকগুলো!' আনমনে বিড়বিড় করল রবিন। তাকিয়ে আছে গল্‌ফ কোর্সের ফোর্টিনথ গ্রিনের দিকে, যেটা শেষ হয়েছে গিয়ে একেবারে সৈকতের কিনারে, ঢেউ আটকানোর জন্য তৈরি করা হবে একটা আধুনিক দেয়াল।

তারপর রবিনের নজর পড়ল স্ক্রোলের একেবারে নিচের দিকে। লেখা রয়েছে: 'আইল্যান্ড রিজোর্ট কোম্পানি'। আনমনে বেশ জোরে জোরেই বলল ও, 'সংক্ষেপে আইআরসি।'

ম্যাপটার আগাগোড়া আরেকবার চোখ বুলাল ও। ঝড়ের গতিতে ভাবনা চলেছে মগজে। সূত্রগুলো জোড়া লাগানোর চেষ্টা করছে। আইল্যান্ড রিজোর্ট কোম্পানি দ্বীপটাকে দখল করার চেষ্টা করছে। আর এ কারণেই

নানা রকম সমস্যা সৃষ্টি করে দ্বীপবাসীকে ভয় দেখিয়ে তাড়াতে চাইছে 'আইআরসি'।

কিন্তু রবিনের মনে পড়ল, রিক আর রিগার মাত্র কয়েক দিন হলো দ্বীপে এসেছে, অথচ দ্বীপের সমস্যাগুলো শুরু হয়েছে গত বসন্তে। ল্যান্ড অ্যাগ্রিমেন্টকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে রিজোর্ট কোম্পানি তাহলে বিশাল প্রাকৃতিক অংশটা ধ্বংসের বুদ্ধি কবে করল?

হঠাৎ কঠিন নোংরা সত্যটা মাথায় ঢুকতে শীতল শিহরণ বয়ে গেল রবিনের মেরুদণ্ড বেয়ে। তার মানে ক্যানারি দ্বীপেরই কোনো বাসিন্দা কোম্পানির সঙ্গে হাত মিলিয়েছে, তাদের হয়ে কাজ করছে, দ্বীপটাকে বিক্রি করার বুদ্ধি করেছে। সেই লোক তার উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য এমন কোনো কাজ নেই, যা করতে পারে না, এমনকি খুন করতেও দ্বিধা করে না। বাক উইনারের বোট ফুটো করে মাঝসাগরে ডুবিয়ে মারার চেষ্টা, ওদের মাথায় ছাউনির চালা ধসানো, দড়ি কেটে দিয়ে ওদের পাহাড় থেকে ফেলে দেওয়ার চেষ্টা, এগুলোই তার প্রমাণ।

যা বোঝার বুঝে গেছে। আর একটা মুহূর্তও সময় নষ্ট করতে চাইল না রবিন। রোল করা ম্যাপটা আবার আগের মতো গুটিয়ে ফেলে সঙ্গে নিল কিশোরকে দেখানোর জন্য। তারপর দুজনে মিলে গিয়ে আগামীকাল সকালে মেইনল্যান্ড থেকে শেরিফ ফিরে এলে তাঁকেও দেখাবে।

প্রচণ্ড উত্তেজিত হয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এল ও। যে জিনিসটা যেখানে ছিল, সেখানে রাখারও প্রয়োজন বোধ করল না। স্ক্রৌলটা না পেলেই রিক আর রিগার বুঝে যাবে কেউ ঘরে ঢুকেছিল, জিনিসপত্র ঘাঁটাঘাঁটি করেছে। কে ঢুকেছে সেটা আন্দাজ করতেও অসুবিধে হবে না ওদের।

পা টিপে টিপে নিচে নেমে এল রবিন। বাতাস স্বাভাবিকের চেয়ে ঠান্ডা, পূর্বদিক থেকে ঝোড়ো হাওয়া বইছে। বাতাসের ঝাপটা থেকে বাঁচার জন্য জ্যাকেটের কলার তুলে দিল ও। রাস্তায় নেমে দ্রুত এগোল। যে সত্যটা জানতে পেরেছে, সেটা কিশোরকে জানানোর জন্য তর সইছে না।

কিশোরও হয়তো আরও সূত্র পেয়েছে। রিকের কাছে নোট লিখেছে যে লোকটা, হয়তো তাকে দেখতে পেয়েছে। ওই লোকটাই হয়তো দ্বীপের সমস্যাগুলো সৃষ্টি করছে। বিল্ডার কোম্পানির সঙ্গে হাত মিলিয়েছে।

ছোট মিউনিসিপ্যাল বিল্ডিংটার পাশ ঘুরতে যাবে ও, এ সময় বড়, কালো একটা জিনিস রাস্তায় পড়ে থাকতে দেখল। কাছে এসে চিনতে পেরে চমকে উঠল। কিশোর! বেহুঁশ হয়ে মাটিতে পড়ে আছে। তাড়াতাড়ি হাঁটু গেড়ে বসে ওর নাড়ি দেখল রবিন। স্বাভাবিক দেখে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। তারপর জ্ঞান ফেরানোর জন্য জোরে জোরে চড় মারতে লাগল কিশোরের দুই গালে।

গুঙিয়ে উঠল কিশোর। তাকে তুলে বসাল রবিন। কিশোরের নাকে-মুখে একটা মিষ্টি কটু গন্ধ পেল। 'কেউ আমাকে...ক্লোরোফরম দিয়ে বেহুঁশ করে ফেলেছে!' মৃদু হাঁপাতে হাঁপাতে বলল কিশোর। 'কে করেছে, জানি না! দেখতে পাইনি!'

কিশোরকে উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করল রবিন। তারপর বাড়ি ফিরে চলল। ধীরে ধীরে পাহাড়ি রাস্তা বেয়ে উঠতে শুরু করল। রিকের ঘরে কী পেয়েছে, হাঁটতে হাঁটতে সব কথা কিশোরকে জানাল রবিন। তীব্র বাতাস পেছন থেকে ঝাপটা মারছে ওদের গায়ে। কাঁপুনি উঠে গেল কিশোরের। এমিলির বাড়িতে পৌঁছে একেক লাফে দু-তিন ধাপ করে সিঁড়ি ভেঙে দোতলায় উঠে এল রবিন। কেরোসিন ল্যাম্পের আলোয় বই পড়তে দেখল মুসাকে।

'কী এনেছি, দেখলে চমকে যাবে, মুসা', ঘরে ঢুকতে ঢুকতে চেঁচিয়ে বলল রবিন। রোল করা ম্যাপটা চেপে রেখেছে বগলের নিচে। পেছনে এসে দাঁড়াল কিশোর।

কিছুই বুঝতে না পেরে একবার রবিনের, একবার কিশোরের মুখের দিকে তাকাচ্ছে মুসা। বলল, 'রবিন উত্তেজিত, তুমি বিধ্বস্ত, কী ব্যাপার, কিশোর?'

'ক্লোরোফরম দিয়ে আমাকে বেহুঁশ করে ফেলা হয়েছিল।' মুসার বিছানার কিনারে বসল কিশোর। 'তবে সে-কথা থাক। রবিন কী পেয়েছে শোনো আগে।'

ম্যাপটা খুলে বিছানার ওপর বিছালো রবিন। দেখে চোখ বড় বড় হয়ে গেল মুসার। চেঁচিয়ে উঠল, 'এ তো ভয়ানক ব্যাপার!'

'রবিন, একটা ব্যাপারে আমার খুব চিন্তা লাগছে', কিশোর বলল। 'তুমি যে ম্যাপটা চুরি করে নিয়ে এলে, রিক আর রিগার বিষয়টা কীভাবে নেবে? মোটেও খুশি হবে না ওরা।'

মাথা চুলকাল রবিন। 'তুমি কী ভাবছ বুঝতে

পারছি', বিড়বিড় করে বলল ও। 'তুমি ভয় পাচ্ছ, আজ রাতেই ওরা আমাদের ওপর হামলা চালাতে আসবে।'

'কিংবা যাদের হয়ে কাজ করছে তাদের কাউকে পাঠাবে, সে যে-ই হোক!' ঝটকা দিয়ে বিছানায় উঠে বসল মুসা। 'আল্লাহ্ই জানে ওরা কারা!'

'কাল সকালে শেরিফ ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সঙ্গে দেখা করব আমরা', কিশোর বলল।

'আজ রাতটা তাহলে সাবধানে কাটাতে হবে আমাদের', মুসা বলল। 'দরজায় তালা দিয়ে রাখা দরকার। সাধারণ তালা। চুরি-ডাকাতি হয় না বলে দরজায় পুলিশ লক কিংবা ডেডবোল্ট-জাতীয় কিছু লাগায়নি এমিলি আন্টি।'

'সামনের দরজার ছিটকানি লাগিয়ে চেয়ার ঠেসে দিয়ে রাখব', রবিন বলল। 'দরজা খুললে চেয়ারের শব্দ হবে। তাতে সাবধান হতে পারব।' বলে দরজার দিকে এগোল ও। পেছনে চলল রবিন।

সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামতে যাবে, হঠাৎ দড়াম করে সদর দরজা খোলার শব্দে থমকে দাঁড়াল। সেই দরজা দিয়ে ঢুকে ঝোড়ো বাতাস ঢুকে অন্ধকার সিঁড়ি বেয়ে উঠে এল। সেই বাতাস বয়ে নিয়ে এল গমগমে একটা ভারী কণ্ঠ, 'ভয়ংকর রাত! অসাবধান হলেই মরতে হবে!'

বারো

একটা মুহূর্ত সিঁড়ির ল্যান্ডিংয়ে বরফের মতো জমে গিয়ে যেন দাঁড়িয়ে রইল দুজনে। কী করবে, কী করলে ভালো হবে, সিদ্ধান্ত নিতে পারল না। আবছা অন্ধকারে পরস্পরের চোখের দিকে তাকাল ওরা। চোখের শুধু সাদা অংশটুকু অস্পষ্টভাবে দেখে বুঝতে পারল দুজনেরই বড় বড় হয়ে গেছে চোখ।

কিন্তু আজ রাতে মরার কোনো ইচ্ছেই নেই আমাদের, ভাবল রবিন। পা টিপে টিপে পিছিয়ে এসে উঠল সিঁড়ির মাথায়। সেখান থেকে গলা বাড়িয়ে নিচে তাকাল।

লিভিং রুমের মাঝখানে ভুঁড়ি ও লাল চুলওয়ালা একজন মানুষকে ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল ও। হাতে একটা পুরোনো আমলের হ্যারিকেন। সেটা সামনে বাড়িয়ে দিয়ে হাঁক দিলেন, 'ছেলেরা, ঘরে আছো তোমরা?'

'মিস্টার রেনিন!' রবিনের পেছন থেকে বলে উঠল মুসা। হাঁকডাক শুনে সে-ও বেরিয়ে এসেছে। রবিন ও কিশোরের পাশ কাটিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামতে লাগল ও। 'আপনি তো আমাদের পিলে চমকে দিয়েছিলেন!'

'দরজাটা আমি খুলেন', মিস্টার রোনন জানালেন 'পাল্লায় হাত লাগাতেই বাতাসে বাড়ি দিয়ে খুলে ফেলল। আমি তোমাদের সাবধান করতে এলাম ভয়ানক ঝড় উঠবে। সাংঘাতিক ঝড়। আমাদের ব্যাটারিচালিত রেডিওতে এইমাত্র খবরটা শুনলাম সমস্ত দরজা-জানালা বন্ধ করে ভালোমতো আটকে রেখো। নইলে সব ভাঙবে। সকালবেলায় দেখো, কত বাড়ির কাচ ভেঙে পড়ে রয়েছে।'

'অনেক ধন্যবাদ আপনাকে, সাবধান করে দিলেন', কিশোর বলল। মিস্টার রেনিন চলে গেলে সদর দরজা লাগিয়ে দিল।

'এমনিতেও আমরা বন্ধ করেই রাখতে চেয়েছিলাম', অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে কিশোর ও মুসার উদ্দেশে হেসে বলল রবিন। 'চলো, শুয়ে পড়ি অকারণে জেগে বসে থাকার কোনো মানে হয় না।'

'ঠিকই বলেছ', মুসা বলল।

*

পরদিন সকালে প্রথম যে জিনিসটা টের পেল কিশোর, সেটা ঠান্ডা। চোখ মেলে দেখল, জানালায় আঘাত হানছে বৃষ্টির ফোঁটা। রবিনের দিকে তাকাল একটা বালিশে মাথা রেখে আরেকটা দিয়ে কান ঢেকে রেখেছে রবিন। কিশোর ডাকল, 'এই রবিন, ওঠো। সময় চলে যাচ্ছে।'

সকাল আটটা বাজে প্রায়। তাড়াতাড়ি উঠে কাপড় বদলে নিল দুজনে। আগের দিন কিছু বাজার-সদাই করে এনেছিল মুসা। তাতে বাইরে না বেরিয়ে সকালের নাশতাটা করা গেল। ফল, ঠান্ডা দুধ আর সিরিয়াল। বাক উইনারের সঙ্গে দেখা করতে যাওয়ার জন্য তৈরি হলো কিশোর ও রবিন। লিভিংরুমে বড় একটা জানালা তৈরি করা হয়েছে, যাকে বলে পিকচার উইন্ডো, ঘরে বসে সাগর দেখার জন্য। সেটা দিয়ে দেখতে পেল ওরা, জাহাজঘাটায় নোঙর ফেলেছে সি স্টার।

ম্যাপটা পাহারা দিতে এমিলির বাড়িতে রয়ে গেল মুসা। স্ক্রোলটা সাবধানে লুকিয়ে রাখা হয়েছে ওর বিছানার মাথার কাছের তক্তার নিচে। কিশোর ও রবিন বেরিয়ে গেলে দরজাটা লাগিয়ে দিল মুসা। ভেতর থেকে লকটা টিপে দিল। জানালার কাচের ভেতর দিয়ে বাইরে তাকিয়ে দুই বন্ধুর উদ্দেশে হাত নাড়ল।

গায়ে চাবুকের বাড়ি মারছে যেন বৃষ্টি মেশানো ঝোড়ো বাতাস। প্রচণ্ড বাতাসের একটা ঝাপটা ধাক্কা মেরে প্রায় ফেলেই দিয়েছিল রবিনকে। 'বাপরে, কী জোর!' বলল ও। 'রেইন পঞ্চো পরে এসে ভালো কাজ হয়েছে।'

'হ্যাঁ', কিশোর বলল। 'নইলে এতক্ষণে ভিজে চুপচুপে হয়ে যেতাম।'

তাড়াহুড়ো করে শেরিফের বাড়িতে চলল ওরা।

দরজায় থাবা দিতেই দরজা খুলে দিলেন শেরিফ 'আরে, তোমরা, এই বৃষ্টির মধ্যে। এসো এসো এইমাত্র ফিরেছি আমি। কফি বানাচ্ছিলাম।'

ভেতরে যাওয়ার আগে গায়ের পঞ্চো থেকে পানি ঝেড়ে নিল ছেলেরা।

'বাক, গতরাতে অনেক ঘটনা ঘটেছে', কিশোর বলল। শেরিফের পেছন পেছন এল তাঁর ছোট নীল সাদা রং করা রান্নাঘরে।

সব কথা খুলে বলল শেরিফকে। রান্নাঘরে কাজ করতে করতে, গম্ভীর মুখে, মনোযোগ দিয়ে ওদের কথা শুনলেন তিনি।

'ওই ম্যাপটা এখানে নিয়ে আসা উচিত ছিল, যত্ন করে রেখে দিতাম', শেরিফ বললেন। 'নইলে কখন ওই শয়তানগুলো ওটা ফেরত নেওয়ার জন্য আবার হামলা চালায় কে জানে।'

'কিন্তু আপনার এখানেও তো জিনিসপত্র নিরাপদে থাকে না', না বলে পারল না কিশোর। 'গতবার স্যালমোনেলার শিশিটা রেখে গিয়েছিলাম, ঠিকই চুরি হয়েছিল।'

'তা ঠিক', কেমন বোকা বোকা দেখাল শেরিফকে। 'ঠিক আছে, যেভাবে আছে, রেখে দাও, কোনোভাবেই যাতে না হারায়। ওটা একটা বড় প্রমাণ।'

'রিক আর রিগারের ব্যাপারে কী ভাবছেন?' প্রশ্ন করল রবিন। 'কী করবেন ওদের?'

'কী করব?' আপনমনে যেন নিজেকেই বোঝালেন শেরিফ, 'ওদের অ্যারেস্ট করতে পারব না। ওরা কোনো অপরাধ করেনি, আইন অমান্য করেনি, অন্তত আমি যত দূর বুঝতে পারছি।'

'বাক, মেইনল্যান্ডে যে কাজে গিয়েছিলেন, তার কী হলো? কী বলল ওরা আপনাকে?' জিজ্ঞেস করল কিশোর। কেসটা সমাধানের একটা পরিষ্কার নির্দেশনা শুনতে চায় ও।

কিন্তু শুনল উল্টোটা। 'আমার ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানালাম বিষয়গুলো। খুব একটা গুরুত্ব দিল না ওরা। বলল, নজর রাখতে, ধীরে ধীরে তদন্ত চালিয়ে যেতে। বরং আমি বেশি তাড়াহুড়ো করছি বলে আমার ওপর খানিকটা রাগই করল।'

'রাগ করল?' বিশ্বাস হচ্ছে না রবিনের। 'ওরা কি বোঝেনি কী ভীষণ ব্যাপার ঘটতে যাচ্ছে এখানে?'

'মানুষের জীবনের ওপর আক্রমণ এসেছে, এ কথা ওদের বলেননি আপনি?' কিশোরের প্রশ্ন।

'নিশ্চয়ই বলেছি', কফিতে দুধ মেশাতে লাগলেন শেরিফ। 'বলেছি, ঘটনাগুলো মোটেও সহ্য করার মতো নয়। ওরা বলল, আমি বেশি রি-অ্যাক্ট করছি।'

'স্যালমোনেলার কথা যখন বললেন, তখন কী বলল?' জানতে চাইল রবিন।

'ওরা বলল মেইনল্যান্ডেও প্রায়ই ফুড পয়জনিংয়ের ঘটনা ঘটে থাকে। ওরা বলল, কোনোভাবে রান্নাঘর থেকেই খাবারে ওই বিষ মিশে গেছে, কিংবা বিষক্রিয়ার ঘটনাটা নিতান্তই কাকতালীয়। তা ছাড়া শিশিতে সত্যিই বিষ ছিল কি না পরীক্ষা করে দেখা হয়নি। লেবেলে লেখা থাকলেও ভেতরে হয়তো আদৌ কোনো বিষ ছিল না। আর ডাক্তারের কথামতো সত্যিই যদি স্যালমোনেলার বিষক্রিয়া হয়েই থাকে, তাহলে কাকে অভিযুক্ত করব?' কাঁধ ঝাঁকালেন শেরিফ।

কথাগুলো শুনতে মোটেও ভালো লাগল না কিশোরের। 'বাক, প্লিজ, আমাদের একটা কথা শুনবেন? মেইনল্যান্ডে আমাদের নিয়ে চলুন, আমরাও পুলিশের সঙ্গে কথা বলব। সবাই মিলে বললে হয়তো এখানকার সত্যিকার পরিস্থিতিটা বোঝাতে পারব।'

'তোমাদের নিয়ে যেতে পারলে খুশিই হতাম', কাপটা তুলে নিলেন শেরিফ। 'কিন্তু এই ঝড়ের মধ্যে মেইনল্যান্ড থেকে পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে এই দ্বীপ।'

'তার মানে?' ভুরু নাচাল রবিন।

'খুব সহজ,' শেরিফ বললেন। 'আবহাওয়া ভালো না হলে আর কোনোমতেই মেইনল্যান্ডে যেতে পারব না।'

'বাক', হঠাৎ ভিন্ন প্রসঙ্গে চলে এল কিশোর, 'মারাত্মক অস্ত্র নিয়ে আপনাকে হুমকি দেওয়ার অভিযোগে বুস্টারকে জেলে যেতে হয়েছিল, এ কথাটা কি সত্যি?'

ভ্রূকুটি করলেন শেরিফ। 'এখন তাহলে বুঝতে পারছ কেন কথাটা তোমাদের বলতে চাইনি আমি। ঘটনাটা ঘটেছে বহুকাল আগে। ফিরে আসার পর নতুনভাবে জীবন শুরু করেছে বুস্টার, সেই অধিকার তার আছে।'

'আমরা শুনেছি, বিশাল সম্পত্তির মালিক ছিলেন বুস্টারের মা, অনেক জমি নাকি ছিল তাঁর', রবিন বলল।

হঠাৎ ঝটকা দিয়ে এমনভাবে উঠে দাঁড়ালেন শেরিফ, কাপ থেকে আরেকটু হলে কফি ছলকে পড়ত। 'হায় হায়, আমি এখানে বসে আলাপ করছি, ওদিকে যে আসল কাজটাই বাকি! ঝড়ের সংকেত ঘোষণা করতে হবে, ছোট নৌযানগুলো যাতে কোনোমতেই এখন সাগরে না বেরোয়। এখনই না বললে ওরা বেরিয়ে যাবে, বেশ কিছু প্রাণ হারানোর ভয় আছে। আমি ডকে যাচ্ছি, ওদের সাবধান করতে।' রান্নাঘরের দরজার পাশ থেকে হুকে ঝোলানো একটা হলুদ রঙের স্লিকার টেনে নিয়ে ফিরে তাকালেন তিনি। 'মরিসনদের জমির ব্যাপারে পরে কথা বলব তোমাদের সঙ্গে। এখন আমাকে অনেক কাজ করতে হবে। অত্যন্ত জরুরি!'

বলে আর দাঁড়ালেন না শেরিফ। একটা মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে রইল দুই গোয়েন্দা। পেছনের আঙিনা দিয়ে শেরিফকে প্রায় ছুটে চলে যেতে দেখল।

'আশ্চর্য!' রান্নাঘরের জানালা দিয়ে তাকিয়ে আছে রবিন। কাচের গায়ে আঘাত হানছে বৃষ্টির ফোঁটা।

'খুবই আশ্চর্য!' একমত হলো কিশোর। 'তবে আপাতত সেটা নিয়ে ভাবনাটা বন্ধ রাখা যাক। আবহাওয়া সত্যিই খুব খারাপ।'

'এখন কী করব? বুস্টারের সঙ্গে দেখা করব?' রবিনের প্রশ্ন।

'ঠিক আমার মনের কথাটা বলেছ', কিশোর বলল। 'এ কথাটাই বলতে যাচ্ছিলাম আমি। কাছাকাছিই ওর বাড়ি। কাল রাতে জুলিয়া রেনিন ম্যাপে ওর বাড়িটা দেখিয়েছিলেন, মনে আছে?'

শেরিফের বাড়ি থেকে বেরিয়ে একটা রাস্তা ধরল, যেটা দিয়ে বুস্টারের বাড়িতে যাওয়া যায়। ওখানে পৌঁছাতে পৌঁছাতে ভিজে চুপচুপে হয়ে গেল ওদের জুতো। বৃষ্টির বেগ বেড়েছে।

কাঠের তৈরি সাধারণ একটা চালাঘরের কাছে এসে দাঁড়াল ওরা। দরজায় থাবা দিতে দিতে ডাকল কিশোর, 'বুস্টার? বুস্টার!' বাড়ির পাশের সুন্দর, মস্ত সবজিখেতটার দিকে তাকাল ও। বুস্টারকে দেখে মনেই

হয় না চাষাবাদও করে ও, কিংবা এত বিশাল জমির মালিক।

আরও কয়েকবার ডাকাডাকি করে সাড়া না পেয়ে রবিন বলল, 'ও মনে হয় বাড়ি নেই। খুঁজে বের করার চেষ্টা করব নাকি?'

জবাব দিতে যাচ্ছিল কিশোর, গাড়ির ইঞ্জিনের শব্দে থেমে গেল। ফিরে তাকিয়ে বুস্টারের পিকআপটাকে আসতে দেখল। 'ওই যে, আসছে! লুকিয়ে থেকে দেখি ও কী করে।'

বুস্টারের উঠানে ফেলে রাখা লাকড়ির স্তূপের আড়ালে লুকালো দুজনে। ট্রাক নিয়ে উঠানে ঢুকল বুস্টার। গাড়ি থেকে সাবধানে চারপাশে তাকাল, ভঙ্গিতে মনে হলো যেন আশপাশে কেউ আছে কি না দেখছে। তারপর ট্রাকের পেছন দিকে চলে গেল। তাতে দুটো বড় বড় বাক্স রাখা আছে। আলাদা আলাদা তেরপল দিয়ে ঢাকা।

একটা তেরপলের একদিক উঁচু করে ভেতরে উঁকি দিল বুস্টার। তারপর অস্বস্তিভরে চারপাশে তাকাল আবার। 'কী রেখেছে?' কিশোরের দিকে মাথা সরিয়ে এনে ফিসফিস করে বলল রবিন। 'চোরাই মাল?'

'হতে পারে', ফিসফিসিয়েই জবাব দিল কিশোর।

একটা বাক্স চেপে ধরে টান দিল বুস্টার। টান দেওয়ার ভঙ্গি দেখেই বোঝা গেল, ভারী কিছু রয়েছে তাতে। তেরপলসহ বাক্সটা মাটিতে নামিয়ে রেখে আবার চারপাশে তাকাল। তারপর গিয়ে ঘরের সামনের দরজার তালা খুলল। ফিরে এসে বাক্সটা তুলে নিয়ে গিয়ে ভেতরে রাখল। আবার ফিরে এসে দ্বিতীয় বাক্সটা ঘরে নিয়ে গেল। কয়েক সেকেন্ড অপেক্ষা করেও ওকে আর বেরোতে না দেখে রবিনকে ইশারায় সঙ্গে আসতে বলে লাকড়ির স্তূপের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল কিশোর। পা টিপে টিপে সামনের একটা জানালার কাছে এসে দাঁড়াল দুজনে। সাবধানে মাথা উঁচু করে উঁকি দিল ঘরের ভেতর। একটা বাক্সের ওপরের তেরপল সরাচ্ছে তখন বুস্টার।

'এ কী!' বাক্সের ভেতরে কী আছে দেখে চমকে উঠল রবিন।

নিজের অজান্তেই মৃদু শিস দিয়ে উঠল কিশোর। 'এগুলো তো কলি জেসনের কুকুর!'

তেরো

দুজনেই একসঙ্গে বুস্টারের ঘরের দরজার দিকে তাকাল কিশোর ও রবিন। সামান্য ফাঁক হয়ে আছে। ভেতর থেকে ছিটকানি লাগায়নি বুস্টার। 'চলো!' ফিসফিস করে কিশোর বলল। 'আমাদের ওপর ও কুকুর লেলিয়ে দেওয়ার আগেই!'

স্প্রিংয়ের মতো লাফিয়ে উঠল দুজনেই। চোখের পলকে নব চেপে ধরে ধাক্কা দিয়ে পাল্লাটা খুলে ফেলল কিশোর। হুড়মুড় করে ঘরে ঢুকে পড়ল দুজনে। চেঁচিয়ে বলল রবিন, 'এইবার আপনাকে হাতেনাতে ধরেছি আমরা!'

চরকির মতো পাক খেয়ে ঘুরে দাঁড়াল বুস্টার বিস্মিত চিৎকার বেরিয়ে এল মুখ থেকে। একটা কুকুরের খাঁচা খোলার হুড়কোর দিকে হাত বাড়াল। কিন্তু ঝট করে পা লম্বা করে দিয়ে ওর বুকে কারাতে কিক মারল কিশোর। ব্যথায় চিৎকার করে উঠে হাতটা সরিয়ে নিল বুস্টার। ঠিক এ সময় ওর পিঠের কাছে লাফিয়ে পড়ল রবিন। বুস্টারের একটা হাত মুচড়ে পিঠের কাছে এনে চেপে ধরল।

মুহূর্তের মধ্যে বিশালদেহী লোকটাকে কাবু করে ফেলল দুই গোয়েন্দা। 'ঠিক আছে, ঠিক আছে, আমি আর কিছু করব না!' হাল ছেড়ে দিয়ে বলল বুস্টার।

'সেটাই ভালো হবে!' চেপে ধরা হাতটায় সামান্য ঢিল দিল রবিন।

ভয়ংকর চাপা গর্জন করছে কুকুরগুলো। একবার সেদিকে তাকিয়ে কিশোর বলল, 'এখন বলুন তো, ঘটনাটা কী? কেন কুকুরগুলোকে চুরি করেছেন?'

'কুকুরগুলোকে ভীষণ কষ্ট দিচ্ছিল কলি', রাগতস্বরে বুস্টার বলল। 'বেশির ভাগ সময়ই খাবার দিত না, যাতে খিদেয় এগুলোর মেজাজ খারাপ হয়ে থাকে। যখন-তখন বেত দিয়ে পেটাত, আমি নিজের চোখে দেখেছি। অত্যাচার করে করে খুনে বানিয়ে ফেলেছিল এগুলোকে। এগুলোর কষ্ট দেখে সহ্য করতে না পেরে তুলে নিয়ে এসেছি।'

অবাক হয়ে পরস্পরের দিকে তাকাতে লাগল দুই গোয়েন্দা।

'কুকুরগুলোর বিষয়টা না হয় বোঝা গেল', রবিন বলল। 'কিন্তু বাকি ঘটনাগুলো কী? আমাদের লক্ষ্য করে তির ছোড়া, দড়ি কেটে পাহাড় থেকে ফেলে মারার চেষ্টা করা, ঘরের চালা মাথায় ফেলা...'

'...তারপর সরাইখানায় স্যালমোনেলার বিষ খাবারে মিশিয়ে দেওয়া', রবিনের কথায় যোগ করল কিশোর।

'কী বলছ?' ঘোঁত করে উঠল বুস্টার। 'আমি ওসব কিছুই করিনি। বাক বলেছে, না? যদি বলে থাকে, মিছে কথা বলেছে।'

'শেরিফ কিছু বলেননি আমাদের', রবিন বলল। 'বরং তোমার মাকে যে কথা দিয়েছিলেন, তোমার অতীত নিয়ে কাউকে কিছু বলবে না, সে-কথা রক্ষা করেছেন?'

'কী ভণ্ডরে বাবা!' মাটিতে থুতু ফেলল বুস্টার। 'সত্যি কথাটা শুনতে চাও? আমি তোমাদের বলতে পারি! আমার বাবা মারা যাওয়ার পর প্রায়ই আমাদের বাড়িতে আসত বাক, ভান করত যেন আমার মাকে সাহায্য করতে আসে। মাকে বোঝাত নিষ্ফলা উৎপাদনহীন জমি আঁকড়ে রেখে লাভ নেই। এই জমিতে কখনো কোনো কিছু বানাতে পারবে না, ওখান থেকে কোনো পয়সা আসবে না, আয় করার কোনো সুযোগ নেই, শুধু শুধু ওটা ধরে রেখে ট্যাক্স দেওয়ার কোনো মানে হয় না। তা ছাড়া প্রতিবছরই ট্যাক্সের টাকা বাড়ছে। মা চাইলে বিনা ভাড়ায় থাকার জন্য একটা ঘরের ব্যবস্থা করে দিতে

পারে, যদি জায়গাটা দলিল করে ওকে দিয়ে দেয়। সই করার জন্য দলিলের কাগজপত্রও সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিল।

'সই করার পরপরই পস্তানো শুরু করল মা। আমি শোনার সঙ্গে সঙ্গে একটা রাইফেল ধার করে নিয়ে ওর বাড়িতে গিয়ে দলিলটা বের করতে বললাম। বললাম, আমার সামনে ওটা না ছিঁড়লে ওখানেই গুলি করে মারব ওকে। ওই জায়গাটা আমার বাবা ভীষণ ভালোবাসত, আর আমি চাইনি ওটা আমাদের হাতছাড়া হয়ে যাক। ওভাবে অস্ত্র হাতে গিয়ে ওকে হুমকি দেওয়াটা হয়তো ঠিক হয়নি আমার, কিন্তু মা যখন বাবার শোকে কাতর, টাকার অভাবে দিশেহারা, সংসার চলবে কীভাবে সেটা নিয়ে উদ্বিগ্ন, ঠিক সে সময় মায়ের দুর্বলতার সুযোগ নেওয়াটাও উচিত হয়নি ওর।'

'এ কারণেই কি আপনাকে ডিটেনশন সেন্টারে পাঠানো হয়েছিল?' কিশোরের প্রশ্ন।

'তোমরা জানলে কী করে?' অবাক হলো বুস্টার। কিশোর ও রবিনকে জবাব দিতে না দেখে মাথা নেড়ে বলল, 'হ্যাঁ, বাক আমাকে ওখানে পাঠানোর ব্যবস্থা করেছিল। তবে আমার কাজ আমি সেরে ফেলেছিলাম, দলিলটা ছিঁড়ে ফেলতে বাধ্য করেছিলাম ওকে। জায়গাটা আর দখল করতে পারেনি ও। মা-ও শেষে বুঝতে পেরেছিল বাক কী করতে চেয়েছিল। মিস্টার অ্যারন গিলবার্ট মাকে কিছু টাকা ধার দিয়েছিল, সেটা দিয়ে ট্যাক্সের টাকা পরিশোধ করেছিল মা। এখন ট্যাক্সের টাকা আমি দিয়ে যাচ্ছি। যতটা সম্ভব পরিশ্রম করে টাকা কামাই, যাতে ট্যাক্সের টাকা আর বাকি না পড়ে।'

'তার মানে আপনি বলতে চাইছেন ক্যানারি আইল্যান্ডে যেসব অপরাধের ঘটনা ঘটেছে, সেগুলো আপনি ঘটাননি?' বিশ্বাস করতে পারছে না রবিন।

'নিশ্চয়ই না!' রাগতস্বরে বলল বুস্টার। 'আমি কেন করব এসব? আমি শুধু এই কুকুর দুটোকে চুরি করে এনেছি, এদের কষ্ট সইতে না পেরে। ঘরের কোণে ওখানে দুটো বিড়ালও আছে', হাত তুলে দেখাল ও। 'বুড়ো হ্যারির কাছে থাকত ওগুলো। পায়ের কাছে ঘুরঘুর করতে দেখলেই লাথি মারত বুড়ো। শেষে আমি নিয়ে এসেছি। প্রাণীদের ভালোবাসি আমি, ওদের কেউ মারতে দেখলে সইতে পারি না। অনেক মানুষের চেয়ে ওরা অনেক ভালো', ক্ষুব্ধকণ্ঠে বলল ও। ঘাড় বাঁকিয়ে রবিনের দিকে তাকাল। বুস্টারের হাতটা ছেড়ে দিল রবিন। অস্থির হয়ে ওঠা কুকুরগুলোর কাছে গিয়ে নরম, মোলায়েম স্বরে বিড়বিড় করে কথা বলতে লাগল বুস্টার। ওদের শান্ত করার চেষ্টা করল।

বুস্টারের দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে ঘরের কোণে বিড়াল দুটোর দিকে তাকাল কিশোর। ওগুলোর তেল চকচকে দেহ দেখেই বোঝা যায় খুব যত্ন নেওয়া হয়, পেটভরে খাবার দেওয়া হয়। খাঁচায় ভরা কুকুরগুলোর দিকে ভয়ে ভয়ে তাকাচ্ছে বিড়াল দুটো, কুকুরের ভয়েই ঘরের কোণে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে। রবিনের দিকে তাকাল কিশোর। সে-ও ওরই মতো দ্বিধান্বিত হয়ে পড়েছে।

সত্যিই কি দ্বীপে ঘটে যাওয়া অপরাধগুলোর জন্য দায়ী নয় বুস্টার? ভাবল কিশোর। নাকি মিথ্যে গল্প বানিয়ে বলে ওদের মন নরম করে ওদের ফাঁকি দিতে চাইছে? বাক একই সঙ্গে শেরিফের দায়িত্বও পালন করছে, ট্যাক্স কালেক্টরের দায়িত্বও পালন করছে। ট্যাক্স চায় বলেই হয়তো বাকের ওপর বুস্টারের রাগ।

'বুস্টার, বেড়াতে এসে সরাইখানায় উঠেছে যে দুজন ব্যবসায়ী, ওদের ব্যাপারটা কী?' কিশোর জিজ্ঞেস করল। 'ওই যে যারা পাহাড়ে ঘুরতে বেরোলেও টাই পরে বেরোয়?'

গর্জন করতে থাকা কুকুরগুলোকে প্রায় শান্ত করে ফেলেছে বুস্টার, খাঁচার দিক থেকে ফিরে তাকাল। 'হ্যাঁ, দেখেছি। ওরা আবার কী করল?'

'আমাদের ধারণা, ওরাও এসব অপরাধের সঙ্গে জড়িত', রবিন বলল। 'যে লোকটা দ্বীপে বসে শয়তানি করছে, তার সঙ্গে হাত মিলিয়েছে ওরা। সত্যি কথাটাই বলি, আমরা আসলে আপনাকে সন্দেহ করেছিলাম।'

'তাই!' হেসে উঠল বুস্টার। 'শহুরে মানুষদের আমি দেখতে পারি না। ওদের সঙ্গে হাত মেলাতে যাব কেন?'

'টাকার জন্য', শীতলকণ্ঠে জবাব দিল কিশোর। 'এইমাত্র আপনি আমাদের বোঝালেন, টাকা আপনার ভীষণ দরকার। এই দ্বীপে একটা রিজোর্ট বানানোর পরিকল্পনা করেছে ওরা। তাই দ্বীপ থেকে স্থানীয় অধিবাসীদের উচ্ছেদ করার কাজে যে-ই ওদের সহায়তা করবে, তাকেই ভালো টাকা দিতে রাজি হবে ওরা।'

'এত কথা জানলে কীভাবে তোমরা?' বুস্টার জিজ্ঞেস করল।

'এই দ্বীপটা ভালোবাসে আমাদের বন্ধু মুসা', রবিন বলল। 'ওকে বলেছি, যে এই দ্বীপে সমস্যার সৃষ্টি করছে, তাকে আমরা খুঁজে বের করার চেষ্টা করব।' নিজেরা যে শখের গোয়েন্দা, সেটা ফাঁস করল না ও। কারণ, বুস্টার

নিজেকে নিরপরাধ বোঝানোর জন্য যত কথাই বলুক, ওকে এখনো সন্দেহমুক্ত ভাবতে পারছে না ওরা।

'হুঁ। তবে বাক উইনারের কথা যদি বিশ্বাস করে থাকো, তো আমার কাছ থেকে সাহায্য পাওয়ার আশা বাদ দাও', ভ্রূকুটি করল বুস্টার। 'ওই লোকটা আমার শত্রু। আর ও মিছে কথা বলে বলে আমার ওপর তোমাদের সন্দেহ জাগিয়েছে, অকারণে সময় নষ্ট করেছ তোমরা।'

'কিন্তু বুস্টার', কিশোর বলল, 'আপনি জানেন, কারও পোষা প্রাণী চুরি করাও অপরাধ। এই কুকুরগুলোকে ওদের মনিবের কাছে ফিরিয়ে দেওয়া উচিত।'

'দেব', জোরে নিঃশ্বাস ফেলল বুস্টার। 'আসলে, বলতে পারো, কয়েক দিনের ছুটি কাটানোর আনন্দ দেওয়ার জন্য এগুলোকে নিয়ে এসেছি আমি। দু-একদিন পরেই আবার ফিরিয়ে দিয়ে আসব। এ সময়ে এদের মনিব হয়তো এরা কতটা প্রয়োজনীয়, বুঝে যাবে, সাবধান হয়ে যাবে আর খারাপ ব্যবহার করবে না।'

'রবিন, চলো, যাই আমরা', কিশোর বলল।

বাইরের বৃষ্টিতে বেরিয়ে এল আবার দুজনে। রবিন বলল, 'ওই লোকটার জন্য মায়াই হচ্ছে আমার।'

'আমারও', অবাক হলো কিশোর, রবিনও ওর মতো একই কথা ভাবছে ভেবে। 'ওর কথা কি বিশ্বাস করেছ?'

'বিশ্বাস করার মতো করেই তো বলল', রবিন বলল। 'তবে যতটা দেখাচ্ছে হয়তো তারচেয়ে অনেক বেশি চালাক ও, আমাদের সহানুভূতি আদায় করার জন্য বানিয়ে বানিয়ে অনেক কথা বলেছে।'

'তবে বাকের ওপর যে রকম রাগ দেখলাম, তাতে ওর বোট ফুটো করে ডুবিয়ে দিতে চাইলে অবাক হওয়ার কিছু নেই', বিড়বিড় করে নিজেকেই যেন বোঝাল কিশোর।

'কিশোর, এক কাজ করি', হঠাৎ দাঁড়িয়ে গেল রবিন, 'আমি এখানে লুকিয়ে থেকে ওর ওপর নজর রাখি। তুমি গিয়ে মিস্টার গিলবার্টের সঙ্গে কথা বলে জানো বুস্টার সত্যি কথা বলেছে কি না। কী বলো?'

'ও ঠিকই বলেছে', কিশোরের প্রশ্নের জবাবে মিস্টার গিলবার্ট বললেন। সরাইখানার মস্ত ফায়ারপ্লেসটার সামনে বসে কথা বলছে দুজনে। বাইরে গর্জন করে ফিরছে ঝোড়ো হাওয়া, উত্তাল সাগরের পানিতে ক্রমাগত আছড়ে পড়ছে বৃষ্টির ফোঁটা। 'তুমি এখন যেখানে বসে আছো, ঠিক ওই জায়গাটাতেই বসে ছিল সেদিন লরা মরিসন। বলছিল বাক উইনারের কুকর্মের কথা। কীভাবে ওর অসহায়ত্বের সুযোগ নিয়ে ওকে দিয়ে দলিল সই করিয়ে নিয়েছিল বাক। কীভাবে ট্যাক্সের টাকার জন্য চাপ সৃষ্টি করে করে লরার মাথা গরম করে দিয়েছিল। আমি ওর কথা বিশ্বাস করেছি। কারণ, আমার সম্পত্তি দখল করার জন্যও অনেক চেষ্টা করেছে বাক।'

প্রচণ্ড এক ধাক্কা খেল কিশোর। 'শেরিফ আপনার সরাইখানা কিনে নিতে চেয়েছেন?'

'বেশ কিছুদিন থেকেই এটার পেছনে লেগেছে ও', মিস্টার গিলবার্ট জানালেন। 'কয়েক মাস ধরে ওর চাপাচাপিটা বেড়েছে। সত্যি বলতে কি, ইদানীং আমি ভাবতে আরম্ভ করেছি, ব্যবসার যা অবস্থা তাতে ওর প্রস্তাব মেনে নেব কি না।'

'মিস্টার গিলবার্ট, আইআরসি কোম্পানির নাম শুনেছেন? আইল্যান্ড রিজোর্ট কোম্পানি?' হঠাৎ প্রশ্নটা ছুড়ে দিল কিশোর।

অন্ধকারে ঢিল ছুড়েছিল ও, তবে জায়গামতোই লাগল। ঝট করে ওপরে উঠে গেল তাঁর ভুরু, মাথা ঝাঁকালেন। 'নিশ্চয়ই শুনেছি। ওদের কথা তুমি জানলে কী করে?'

প্রশ্নটা এড়িয়ে গিয়ে কিশোর জিজ্ঞেস করল, 'ওদের কথা কী জানেন আপনি?'

'গত গ্রীষ্মে একটা মেয়েকে দিয়ে আমার জায়গাটা কিনে নেওয়ার প্রস্তাব পাঠিয়েছিল আমার কাছে। টাকা যা দিতে চেয়েছিল, অনেক। কিন্তু বাইরের কারও কাছে জায়গাটা বিক্রি করতে মন চায় না আমার। বিশেষ করে কোনো বড় কোম্পানির কাছে, যারা এসে জায়গাটাকে ধ্বংস করে ফেলবে।'

'আসলে সেটা করারই পরিকল্পনা করেছে ওরা', কিশোর বলল। 'থ্যাংক ইউ, মিস্টার গিলবার্ট। অনেক মূল্যবান তথ্য পেলাম আপনার কাছে। মনে হচ্ছে, কেসটার একটা কিনারা করে ফেলতে পারব এখন।'

সরাইখানা থেকে বেরিয়ে, ঝোড়ো বাতাস আর বৃষ্টি উপেক্ষা করে যতটা সম্ভব তাড়াতাড়ি হেঁটে এমিলির বাড়িতে ফিরে চলল ও। মুসাকে সব কথা জানিয়ে, আবার রবিনের কাছে ফিরে যাবে। শেরিফের সঙ্গে দীর্ঘ বৈঠকের সময় এসেছে।

'মুসা!' বাড়ি ফিরে দরজা বন্ধ দেখে ডাক দিল কিশোর। সাড়া না পেয়ে দরজায় জোরে জোরে ধাক্কা দিতে লাগল।

কোনো জবাব না পেয়ে, শেষে পকেট থেকে চাবি বের করে পুরোনো তালাটা খুলল। নব ঘুরিয়ে দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল। আবার ডাকল মুসার নাম ধরে। জবাব নেই। কেমন ভুতুড়ে নীরবতা। মুসার নাম ধরে ডাকতে ডাকতে একেক লাফে দু-তিন ধাপ করে সিঁড়ি ডিঙিয়ে দৌড়ে ওপরে উঠতে শুরু করল।

মুসার ঘরে ওকে পাওয়া গেল না। পাওয়া গেল না কোনো ঘরেই। সন্দেহ হলো কিশোরের। কিছু একটা নিশ্চয় ঘটেছে। খারাপ কিছু। তাড়াহুড়ো করে আবার নিচে নেমে এল ও। নইলে এই প্রবল ঝড়বৃষ্টির মধ্যে কিছুতেই ঘর থেকে বেরোত না মুসা। লিভিং রুমে এসে কফি টেবিলের ওপর একটা ভাঁজ করা কাগজ চাপা দেওয়া দেখতে পেল কিশোর। এক মুহূর্তের জন্য স্বস্তি বোধ করল। যাক, কোথায় গেছে লিখে রেখে গেছে।

কাগজের ভাঁজ খুলে পড়ল ও, 'প্রিয় কিশোর ও রবিন, আইআরসির ওই দুজন লোক এসেছিল তোমাদের খোঁজে। আমাকে ম্যাপটার কথা জিজ্ঞেস করেছে। আমি বলেছি, দেখিনি। আমার কথা ওরা বিশ্বাস করেছে বলে মনে হয়নি আমার। তাই ওদের পিছু নিলাম। উদ্বিগ্ন হয়ো না। ম্যাপটা সঙ্গে করে নিয়ে গেলাম। মুসা।'

চিন্তিত ভঙ্গিতে কাগজটা আবার ভাঁজ করে প্যান্টের পকেটে ঢুকিয়ে রাখল কিশোর। এই লোকগুলো ভয়ংকর। মুসা হয়তো কল্পনাই করতে পারেনি, কী বিপদের পথে পা বাড়িয়েছে। সামান্যতম ভুলের কারণে এমনকি মৃত্যুও ঘটতে পারে ওর।

চৌদ্দ

এমিলির বাড়ি থেকে কামানের গোলার মতো ছিটকে বেরিয়ে এল কিশোর। এক সেকেন্ড নষ্ট করার সময় নেই। ভয়ানক বিপদের মধ্যে ঢুকেছে মুসা।

হক'স হিল রোডে এসে পলি ও তার অ্যাকর্ন সোসাইটির সদস্যদের পাহাড়ের ওপর থেকে নেমে আসতে দেখল। ক্রমশ বাড়তে থাকা ঝড়ের কারণে প্রচণ্ড উদ্বিগ্ন মনে হচ্ছে ওদের। বাতাসের বেগ আরও বেড়েছে। বারবার ঝোড়ো বাতাসের ঝাপটা এসে চাবুকের মতো আছড়ে পড়ছে যেন গায়ে।

'শুনুন!' ডাক দিয়ে ওদের দিকে দৌড়ে গেল কিশোর। 'আমি মুসাকে খুঁজছি। আমাদের সেই মোটা নিগ্রো বন্ধুটি, যে বনের মধ্যে আপেল খেয়েছিল, তাকে দেখেছেন?'

স্লিকারের হুডের নিচ দিয়ে চোখ মিটমিট করল পলি। জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকাল। 'এই, তোমাকে চিৎকার করতে মানা করেছি না? আর তোমার প্রশ্নের জবাব দিতে দিতে ক্লান্ত হয়ে গেছি আমি।'

'প্লিজ, এটা খুব জরুরি। পাহাড় থেকে নামার সময় কাউকে দেখেছেন?' কিশোর জিজ্ঞেস করল।

'অবশ্যই না', পলি জবাব দিল। 'এ রকম দিনে কেউ ওদিকে যায় না। আমাদের সোসাইটিতে আমরা ঝড়কে ভয় পাই, কারণ যারা প্রকৃতিকে ভালোবাসে তারা ঝড়কে ভয় পাবেই, কারণ তখন প্রকৃতি ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। আমরা, অ্যাকর্ন সোসাইটির সদস্যরা, প্রকৃতির শান্ত রূপকে...'

'পলি, প্লিজ!' বাধা দিল কিশোর। 'আমি খুব বিপদে আছি। আমার বন্ধু হারিয়ে গেছে।'

'হয়তো তোমার বন্ধুকে খুঁজতে যেতে সাহায্য করতে পারি আমরা', পলির পাশের লোকটি বলল। 'মানুষের প্রতি ভালোবাসা আর মমতা দেখানোও আমাদের অ্যাকর্ন সোসাইটির একটা প্রধান নীতি।'

'এই কথাটা সত্যিই ভালো লাগল আমার', কৃতজ্ঞ ভঙ্গিতে বলল কিশোর। 'আমার ধারণা, যে লোক দ্বীপে সমস্যাগুলো সৃষ্টি করছে, সে-ই আমার বন্ধুকে নিয়ে গেছে। ওর কাছে এমন একটা জিনিস আছে, যেটার জন্য ওরা মরিয়া হয়ে উঠেছে।'

'কী জিনিস?' একজন মহিলা জিজ্ঞেস করল।

'এখন সেটা বুঝিয়ে বলার সময় নেই। আমার আরেক বন্ধুকেও ডাকতে যেতে হবে', কিশোর বলল।

'ঠিক আছে', পলি বলল, 'ছড়িয়ে পড়ে খোঁজা শুরু করব আমরা। তোমার বন্ধুকে পাওয়া গেলে সরাইখানায় নিয়ে যাব।'

'অনেক ধন্যবাদ আপনাকে', কিশোর বলল। 'তাহলে আমি সত্যিই ঋণী হয়ে যাব আপনার কাছে।'

মাথা ঝাঁকাল পলি। দলের সদস্যদের দিকে ফিরে বলল, 'শোনো, আমরা আমাদের "ঝড়-ভ্রমণ" আপাতত ক্ষান্ত করে একজন মানুষকে সাহায্য করব, হারানো মানুষের খোঁজে বেরোব।'

প্রকৃতির প্রতি যতখানি ভালোবাসা, মানুষের প্রতিও ততখানিই ভালোবাসা মহিলার, জেনে ভালো লাগল কিশোরের। সময় নষ্ট না করে দৌড়ে চলল বুস্টারের বাড়িতে। ওখানে যখন পৌঁছাল, ভিজে চুপচুপে হয়ে গেছে। হাঁপাচ্ছে জোরে জোরে। রবিনকে বুস্টারের বাড়ির সীমানাতেই পেল, একটা ঝোপের ভেতর। জানাল, 'মুসা নেই বাড়িতে!' পকেট থেকে কাগজটা বের করে রবিনকে পড়তে দিল।

'কাজটা খুব খারাপ হয়ে গেল!' হতাশায় চিৎকার করে উঠল রবিন।

'হক'স হিল রোড ধরে ওপরের দিকে যায়নি ও, হয়তো নিচে নেমে মেইন রোড দিয়ে গেছে। চলো, ওদিকে খোঁজ করি', কিশোর বলল।

মেইন রোডে যখন পৌঁছাল ওরা, মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছে, দিনটা হয়ে গেছে প্রায় রাতের মতো অন্ধকার। গর্জন করে ফিরছে বাতাস, ঢেউগুলোকে এনে আছড়ে ফেলছে পাথুরে সৈকতে, এমনকি বন্দরের নিরাপত্তা বেষ্টনীও সে ঢেউ আটকাতে পারছে না। বোটগুলোকে দোলাচ্ছে এমন করে, যেন ওগুলো বাদামের খোসা। দূরে, মেইনল্যান্ডের দিকে, ক্রমাগত বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, আকাশটাকে চিরে দিয়ে যাচ্ছে বারবার।

দমকল বাহিনীর অফিসটাকে পাশ কাটাল দুজনে। পাম্প ওয়াগন রেডি রেখেছে দ্বীপের স্বেচ্ছাসেবী কর্মীরা। ওয়াগনে পানি ভরা। কোথাও আগুন লাগলে সেটা টেনে নিয়ে যাওয়া হয়।

'বুস্টারকে কেউ দেখেছ?' টম জিজ্ঞেস করল। প্রথম দিনই ক্যানারি আইল্যান্ডের ডকে নেমে ওকে দেখেছে গোয়েন্দারা, হ্যারি নামে আরেকজনের সঙ্গে মারপিট বাধিয়েছিল। 'ওর ট্রাকটা এখন দরকার, ওয়াগনটা টানার জন্য। বজ্রপাত হয়ে কোথাও আগুন লেগে গেলে সেটা ছড়াতে দেওয়া যাবে না।'

'আমাদের শেরিফ কোথায়, ওকে দেখি না কেন!' সেই হ্যারিই বলল, যে টমের সঙ্গে মারামারি করেছে, যার চিংড়ির ফাঁদ চুরি হয়েছে। 'ও তো জনগণের সেবক, জনগণ যখন চাইছে তখন কোথায় নিরুদ্দেশ হয়ে আছে?'

'শেরিফ একটু আগে ডকের দিকে গেছেন', কিশোর জানাল।

'ওখানে তো নেই', হ্যারি জবাব দিল। 'এইমাত্র দেখে এসেছি।'

খুদে পাম্পটার দিকে তাকিয়ে ভাবছে কিশোর, এটাতে যেটুকু পানি ধরে তা দিয়ে আগুন ছড়ানো কতখানি বন্ধ করা যাবে, সন্দেহ আছে। স্বেচ্ছাসেবীদের জিজ্ঞেস করল, মুসা, রিক কিংবা রিগারকে দেখেছে কি না। কিন্তু কেউ দেখেনি।

শহরের ভেতর দিয়ে দৌড়ে চলল আবার কিশোর ও রবিন। আর্ট গ্যালারি ছাড়িয়ে, কফি শপের পাশ কাটিয়ে এল। ঝড়ের আক্রমণ থেকে বাঁচার জন্য দুটো বাড়িরই দরজা-জানালা শক্ত করে লাগিয়ে দেওয়া

হয়েছে। আসলে, শহরের প্রায় সব বাড়িরই জানালা-দরজা আটকানো।

'সবাই বলে ছোট্ট দ্বীপ', রবিন বলল, 'কিন্তু কাউকে খুঁজে বের করা দেখা যাচ্ছে বিরাট ঝামেলা।'

'ঠিকই বলেছ', কিশোর বলল। 'যাদের সঙ্গে দেখা হয়েছে, তাদের কেউই দেখেনি ওকে। দ্বীপের যে কোনো বাড়ির ভেতর থাকতে পারে এখন মুসা।'

'মেইনল্যান্ডের পুলিশের সঙ্গে যদি কোনোভাবে যোগাযোগ করা যেত', রবিন বলল। 'যত ঝড়ই হোক, ওরা এখানে ঠিকই চলে আসত, পুলিশের কুকুর দিয়ে খুঁজে বের করতে পারত মুসাকে...'

'কোনোই উপায় নেই রবিন', কিশোর বলল। 'তুমিও জানো, আমিও জানি, দ্বীপে কোনো টেলিফোন সিস্টেম নেই, মোবাইল ফোনের টাওয়ার নেই। মেইনল্যান্ডের সঙ্গে যোগাযোগের কোনো ব্যবস্থাই নেই।'

'মেইনল্যান্ডের সঙ্গে যোগাযোগ করতে চাইছ?' পেছন থেকে বলে উঠল একটা কণ্ঠ। ফিরে তাকিয়ে দুই গোয়েন্দা দেখল মিস্টার অ্যারন গিলবার্ট দাঁড়িয়ে আছেন। গায়ে পানি নিরোধক পোশাক, মাথায় রেইন হ্যাট। 'এইমাত্র ডকে গিয়েছিলাম, আমার বোটটা ঠিক আছে কি না দেখতে। শক্ত করে বেঁধে রেখে এলাম। এ ঝড়টা সত্যিই খুব খারাপ।'

'আমাদের বন্ধু মুসা নিখোঁজ হয়েছে, হয়তো মারাত্মক বিপদের মধ্যে রয়েছে এখন', কিশোর বলল। 'রিক আর রিগার, যারা আইআরসির হয়ে কাজ করছে, তাদের পিছু নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেছে ও।'

বার দুই চোখ মিটমিট করে ভ্রূকুটি করলেন মিস্টার গিলবার্ট। 'মেইনল্যান্ডের সঙ্গে যোগাযোগ করতে চাইলে বাকের হ্যাম রেডিওটাই তো আছে।'

স্তব্ধ হয়ে গেল কিশোর ও রবিন। পরস্পরের দিকে তাকাতে লাগল। ঘন ঘন শ্বাস টানল রবিন। 'বাকের রেডিও আছে?'

'নিশ্চয় আছে', মিস্টার গিলবার্ট বললেন। 'ও তো শেরিফ, তাই না? সব শেরিফের কাছেই থাকে, ইমার্জেন্সির সময় ব্যবহারের জন্য।'

'তাহলে ওটার কথা আমাদের বলল না কেন?' আনমনে বিড়বিড় করল কিশোর।

'কারণ, ও একটা ধাপ্পাবাজ, মিথ্যুক, বুস্টার ঠিক কথাই বলেছে!' হঠাৎ যেন বিস্ফোরিত হলো রবিন। 'এখন আমার কাছে সব পরিষ্কার হয়ে গেছে, কিশোর। বাক উইনারই সেই লোক, যাকে খুঁজছি আমরা!' কপাল চাপড়াল ও। 'ইস্, আগে কেন বুঝতে পারিনি?'

'আমি জানি, কেন পারিনি', কিশোরের কণ্ঠেও উষ্মা। 'বোটের ওই ফুটোটা।'

'আমাদেরকে মাছ ধরতে নিয়ে গিয়েছিল ও আনন্দ দেওয়ার জন্য নয়', কিশোরের সুরে সুর মেলাল রবিন। 'নিয়ে গিয়েছিল বিপথে চালিত করার জন্য।'

'কিন্তু এখনো আমাদের প্রমাণ দরকার, রবিন!' অশান্ত কণ্ঠে বলল কিশোর। 'চাচা কী বলে, মনে আছে? কাকে আমরা অপরাধী ভাবলাম, সেটা বিষয় নয়, যতক্ষণ প্রমাণ হাজির করতে না পারব কোনো আদালত সেটা গ্রহণ করবেন না!' ওর চাচা রাশেদ পাশা রকি বিচের একজন পেশাদার গোয়েন্দা, আগেই বলা হয়েছে। তাঁর দীর্ঘ জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে তিনি অনেক কিছু শিখেছেন। মাঝে মাঝেই সেসব শিক্ষা দিয়ে থাকেন কিশোরদের।

'তোমরা কী বলছ আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না', দুই গোয়েন্দার মুখের দিকে তাকাতে লাগলেন মিস্টার গিলবার্ট।

'বুঝিয়ে বলার সময় নেই এখন', কিশোর বলল তাঁকে। 'আমাদের এখন রেডিওটা দরকার।'

ওরা যেখানে রয়েছে, সেখান থেকে বাকের বাড়ি দূরে নয়। তাড়াহুড়ো করে ওখানে চলে এল দুজনে জোর করে তালা খুলে ঢুকল। মিস্টার গিলবার্টও এলেন পেছন পেছন। 'তোমরা যা করলে, বাকের তা মোটেও ভালো লাগবে না', খুশি খুশি গলায় বললেন তিনি 'রেডিওটা সম্ভবত ওপরতলায় রয়েছে, ওর অফিসে।'

'আমি তো জানতাম ওর অফিসটা এখানে, নিচতলায়', কিশোর বলল।

'না', মিস্টার গিলবার্ট বললেন, 'এখানে যেটা দেখেছ সেটা ওর স্টোররুম।'

দৌড়ে ওপরতলায় উঠে এল ওরা। টেবিলে দেখা গেল বেশ বড় সাইজের রেডিওটা। তাড়াতাড়ি চেয়ার টেনে ওটার সামনে বসে পড়ল কিশোর। ডায়াল করতে লাগল। হেডসেটটা কানে লাগিয়ে ওর পাশে দাঁড়িয়ে রইল রবিন।

'কোনো শব্দ নেই!' ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলল ও 'ফ্রিকোয়েন্সি পাচ্ছ না কেন?'

'আমি বুঝতে পারছি কেন পাচ্ছ না', বললেন টেবিলের অন্য পাশে দাঁড়ানো মিস্টার গিলবার্ট। ঝুঁকে দাঁড়িয়ে আঙুল তুলে দেখালেন।

'ব্যাটারির কানেকশনের তারগুলো নেই!' গম্ভীর স্বরে বলল কিশোর।

'তাহলে লাগাও!' রবিন বলল।

'কোত্থেকে লাগাব! এখানে তো নেই। আরেক জোড়া তার খুঁজে বের করে লাগানোর সময় নেই', কিশোর বলল। 'মুসার খোঁজ পাইনি আমরা এখনো, ভুলে যেয়ো না।'

'শয়তান!' অনুপস্থিত শেরিফের উদ্দেশে চেঁচিয়ে বলল রবিন। রাগ করে লাথি মারল টেবিলের পাশে রাখা একটা ধাতব ওয়েস্টবাস্কেটে, হতাশায়।

'বাক কোনো ঝুঁকি নিতে চায়নি', কিশোর বলল। 'তার খুলে ফেলে দিয়েছে, যদি কোনোভাবে দেখে ফেলি রেডিওটা, তাই।'

'আরে, এটা কী?' হঠাৎ বলে উঠে, উবু হয়ে গেল রবিন। বাস্কেটের কাছে ডেস্কের নিচ থেকে একটা লোহার বাক্স টেনে বের করল। টাকা, গহনা, এ ধরনের মূল্যবান জিনিস রাখা হয় এসব বাক্সে। বাক্সের ডালার ফাঁক দিয়ে একটা ১০০ ডলারের নোটের কোনা বেরিয়ে আছে।

'দেখি তো কী আছে এতে', উত্তেজিত ভঙ্গিতে বলল কিশোর। বাক্সটায় তালা দেওয়া। পকেটনাইফ বের করে ফলা ঢুকিয়ে তালাটা খুলে ফেলল ও। ডালা তুলে ভেতরে তাকিয়ে অবাক হয়ে গেল। কড়কড়ে ১০০ ডলারের নোটের বান্ডিলে ভর্তি বাক্সটা।

'এত টাকা কোথায় পেল বাক?' একটা বান্ডিলে আঙুল বোলালেন মিস্টার গিলবার্ট। 'এখানে কম করে

হলেও আড়াই লাখ ডলার আছে!'

টাকার বান্ডিলের নিচে একটা প্যাডের কাগজ পাওয়া গেল, মাথার কাছে আইআরসি সিল মারা। কাগজটা তুলে নিয়ে জোরে জোরে পড়ল কিশোর, 'আইআরসির তরফ থেকে আড়াই লাখ দেওয়া হলো। বাকি আড়াই লাখ ১৫ আগস্টের মধ্যে দেওয়া হবে।' নোটটা পকেটে রেখে দিয়ে ফিরে তাকাল ও। 'রবিন, একটা কাজের কাজই করেছ!' আনন্দে চেঁচিয়ে উঠে বলল। 'প্রমাণ জোগাড় করে ফেলেছ!'

পনেরো

'আমি যা ভাবছি তোমরা কি সেটাই বলতে চাইছ?' নোটের বান্ডিলগুলোর দিকে তাকিয়ে আছেন মিস্টার গিলবার্ট।

'আপনি কী ভাবছেন, জানি না', কিশোর বলল, 'তবে ক্যানারি দ্বীপ ধ্বংস করার জন্য যে আইল্যান্ড রিজোর্ট কোম্পানির [আইআরসি] সঙ্গে হাত মিলিয়েছে বাক উইনার, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।'

'সেদিন নিজের ঘরের তালা নিজেই ভেঙে রেখে আমাদেরকে বোঝাতে চেয়েছে স্যালমোনেলার শিশি অন্য কেউ চুরি করে নিয়ে গেছে', রবিন বলল।

'ভাবো', মাথা নাড়তে নাড়তে বলল কিশোর, 'ওর হাতেই আমি বিষের শিশিটা তুলে দিয়েছিলাম!'

'কোম্পানির জন্য ওর চেয়ে উপযুক্ত আর কেউ এ দ্বীপে নেই। যার ক্ষমতা আছে, যে দ্বীপটাকে খুব ভালোমতো চেনে', তিক্ত কণ্ঠে বলল রবিন।

'আরে!' হঠাৎ বলে উঠল কিশোর। 'আমরা এখানে বসে বসে কথা বলছি। অথচ মুসা এখনো নিখোঁজ। এসব আলোচনা পরেও করা যাবে। চলো চলো, একটা সেকেন্ড নষ্ট করা যাবে না আর!'

'আমি তোমাদের কোনোভাবে সাহায্য করতে পারি?' মিস্টার গিলবার্ট জিজ্ঞেস করলেন।

'সবাইকে গিয়ে বলুন, বাক আর ওর দুই সহকারীর দিকে যেন নজর রাখে', কিশোর বলল। 'ওদেরকে দেখলেই যেন আটকায়, যাতে আরও ক্ষতি করতে না পারে!'

'যাচ্ছি', মিস্টার গিলবার্ট বললেন। 'গুড লাক, বয়েজ। আমি জানতাম বাক খারাপ লোক। এবার বোধহয় ওর হাত থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে।'

মিস্টার গিলবার্টের পেছনে প্রায় একই সঙ্গে বেরিয়ে এল দুই গোয়েন্দা। বৃষ্টি সামান্য কমে এসেছে, বাতাসের বেগও কমছে। কিন্তু দূরে ঘন ঘন বজ্রপাতের আওয়াজ বুঝিয়ে দিচ্ছে, ঝড়টা চলে যেতে এখনো অনেক দেরি।

'কিন্তু গেল কোথায় মুসা?' চারপাশের গ্রাম আর জাহাজঘাটার দিকে তাকাল রবিন।

'একটা কথা ভাবো, রবিন', কিশোর বলল, 'তুমি যদি রিক বা রিগার হতে, আর যদি ম্যাপটা আমাদের হাতে রয়েছে জানতে, তাহলে কী করতে?'

'এমিলির বাড়িতে গিয়ে চুরি করে আনার চেষ্টা করতাম', রবিন জবাব দিল।

'কিন্তু তুমি যদি গিয়ে দেখো বাড়িতে মুসা রয়েছে, ম্যাপটা পাহারা দিচ্ছে, তখন?'

'তাহলে বাকের কাছে যেতাম, ম্যাপটা হাতে পাওয়ার কোনো বুদ্ধি দিতে পারে কি না ও, জানার জন্য', রবিন বলল।

'একদম ঠিক!' কিশোর বলল। 'প্রথমে এমিলির বাড়িতেই গিয়েছিল ওরা, ওখান থেকে মুসা ওদের পিছু নেয়। আর তারপর কী করেছিল ওরা?' চারপাশে তাকাতে তাকাতে মাথা চুলকালো ও।

'তারপর যেখানেই যাক ওরা, এই বাড়িটা থেকেই গিয়েছে', রবিন বলল।

'তবে বাড়ির সামনের দরজা দিয়ে বেরোয়নি ওরা, কারও চোখে পড়ার ভয়ে', কিশোর বলল। 'পেছন দিক দিয়ে বেরিয়েছে।'

দ্রুত বাড়ির পাশ ঘুরে পেছনে চলে এল দুজনে। আঙিনা জুড়ে বড় বড় বার্চ গাছের জটলা আর তার ভেতর দিয়ে একটা রাস্তা চলে গেছে বনের ভেতর।

'ওটা কী?' রাস্তার দিকে আঙুল তুলল কিশোর।

'চকোলেট চিপ কুকির টুকরো, ভিজে গেছে', ঝুঁকে দেখে বলল রবিন। কিছুটা সামনে তাকিয়ে বলল, 'এই যে, আরেক টুকরো! ওই যে, আরও এক টুকরো!'

'মুসা ছাড়া আর কেউ না!' হেসে বলল কিশোর। 'বুদ্ধিটা ভালোই করেছে। ইচ্ছে করেই ফেলে রেখে গেছে। আমাদের চোখে পড়ানোর জন্য।'

'জলদি চলো!' চেঁচিয়ে বলল রবিন।

রাস্তাটা ধরে দ্রুত বনের ভেতর ঢুকে পড়ল দুজনে। বৃষ্টিতে পাতা ভিজে গিয়ে টুপটাপ পানির ফোঁটা পড়ছে। দুবার ওরা দুটো চৌরাস্তায় এসে পড়ল, তবে দুবারই পড়ে থাকা বিস্কুটের গুঁড়ো ওদেরকে পথ দেখাল। তৃতীয় চৌরাস্তাটায় এসে হঠাৎ করেই চিহ্ন শেষ হয়ে গেল। 'এখান থেকে দৌড়ে পালাল নাকি?' রবিন বলল।

'কিংবা ও ধরা পড়ে গেছে', চিন্তিত ভঙ্গিতে জবাব দিল কিশোর। চৌরাস্তায় একটা সাইনবোর্ড রয়েছে। তাতে তিরচিহ্ন দিয়ে বোঝানো হয়েছে, কোন রাস্তাটা কোন দিকে গেছে। একটা চিহ্ন বলছে ক্যাথেড্রাল ফরেস্ট। আরেকটা : আইস হাউস।

'আইস হাউস', রবিন বলল। 'সেটা আবার কী?'

'ম্যাপে দেখেছিলাম, ভুলে গেছ? ওটা পুরোনো আমলের রেফ্রিজারেটর। পাকা ঘর বানিয়ে তাতে শীতকালে পুকুরে জমা বরফের টুকরো কেটে ভরে রাখত লোকে। মাছ-মাংস ভালো রাখার জন্য।'

'কিন্তু, কোন দিকে যাব এখন?' রবিনের প্রশ্ন।

'পলি আর তার সঙ্গীরা ক্যাথেড্রাল ফরেস্ট আর পাহাড়ের চূড়ায় খুঁজছে', কিশোর বলল।

'আমরা তাহলে আইস হাউসেই যাই', বলল রবিন।

রাস্তা ধরে প্রায় ছুটে চলল দুজনে। শিগগিরই একটা বড় পুকুরের কাছে চলে এল। পুকুরটার ওপারে একটা পুরোনো কাঠের বাড়ি, দেখে মনে হয় গোলাঘর। কয়েক জায়গায় ভাঙা। দোতলায় রাখা একটা মরচে পড়া লোহার ক্রেন। ছাতের একটা ফোকর দিয়ে বেরিয়ে আছে ক্রেনের মাথা। 'মনে হয়, পুকুর থেকে বরফ কেটে ওই ক্রেন দিয়েই তোলা হতো।'

পা টিপে টিপে নিঃশব্দে বাড়িটার দিকে এগিয়ে চলল ওরা। বাড়ির কাছে পৌঁছে একটা ভাঙা জানালার নিচে বসে পড়ল। তারপর সাবধানে মাথা উঁচু করে উঁকি দিয়ে ভেতরে তাকাল। কানে এল বাকের পরিচিত কণ্ঠ। এইচআরআই কোম্পানির লোকগুলোর সঙ্গে কথা বলছে।

'বাকি টাকাটা এখনই দিতে হবে আমাকে', বাক বলছে। 'ওই ছেলেগুলো তোমাদের সন্দেহ করে ফেলেছে। তোমাদের ধরিয়ে দিতে বিচ্ছুগুলোর খুব বেশি সময় লাগবে না।'

'কিন্তু বাক', রিকের গলা শোনা গেল, 'ওরা যে ঝামেলা করছে, সেটা তো আমাদের দোষ নয়।'

'তবে কি আমার দোষ?' ঝাঁজিয়ে উঠল বাক। 'বিড়ালের মতো শক্ত জান ওদের, ওই যে কথায় বলে না, নয়টা প্রাণ। আমি ওদের দড়ি কেটে পাহাড় থেকে ফেলে মারতে চেয়েছিলাম। কিন্তু বেঁচে গেছে। ওল্ড বার্নার শ্যাকের বর্গার কাঠ করাত দিয়ে কেটে রেখেছিলাম, যাতে ওদের ওপর ভেঙে পড়ে। ওরা ওখান থেকেও হেঁটে বেরিয়ে চলে এসেছে। দু-একটা আঁচড় লাগা ছাড়া আর কিছুই হয়নি ওদের। খোদার কসম, আমি তির ছুড়েও একটাকে মেরে ফেলতে চেয়েছিলাম!'

'আসলে বড় শয়তানটাকেই আগে খতম করা উচিত ছিল তোমার। ক্লোরোফরম দিয়ে বেহুঁশ না করে মেরে ফেললেই ভালো হতো', শোনা গেল রিগারের কণ্ঠ। 'এত ভালো সুযোগ আর ছিল...'

'দেখো, আমি যা বলি শোনো তোমরা', বাধা দিয়ে বলল রিক। 'এখানে আমরা যা করে যাচ্ছি, তা-ই করতে থাকব। আমাদের প্ল্যানমাফিকই কাজ হচ্ছে। দ্বীপ ছেড়ে চলে যেতে আরম্ভ করেছে লোকে। অনেক বাড়িতে "বাড়ি বিক্রি"র নোটিশ ঝুলিয়ে দিয়েছে। ট্যাক্স দেওয়ার জন্য বুস্টার মরিসন যে টাকা জমিয়েছে, সে টাকাটা মেরে দিতে পারলে আর অ্যারন গিলবার্টকে ভয় দেখিয়ে তাড়াতে পারলেই, ল্যান্ড অ্যাগ্রিমেন্টের দলিলগুলো বদলে দিতে পারবে বাক। ক্যানারিতে ঢুকতে তখন আর কোনো বাধা থাকবে না কোম্পানির। তার পরেও যেসব স্থানীয়রা থেকে যাবে, তারা কোম্পানির গোলাম হয়ে সুপার-রিজোর্টে চাকরি করতে বাধ্য হবে। আর তখন তুমি, বাক, তোমার ইচ্ছেমতো যেকোনো চাকরি চাইতে পারবে, সিকিউরিটির হেড হতে পারবে, কিংবা কোম্পানির কাছ থেকে প্রচুর টাকা নিয়ে দক্ষিণের কোনো উষ্ণ, রোদেলা অঞ্চলে চলে গিয়ে পায়ের ওপর পা তুলে বসে কাটাতে পারবে।'

ওদের কথাবার্তা লোম খাড়া করে দিল কিশোরের। রাগে রক্ত যেন ফুটতে শুরু করল। রবিনের দিকে তাকাল। ওর হাত মুঠোবদ্ধ হয়ে যেতে দেখে বুঝল, একই অবস্থা হয়েছে রবিনেরও।

'সেসব পরের কথা', বাক বলল। 'এখন আমি আমার বাকি টাকাটা চাই। যা বলেছ করে দিয়েছি, এখন ওই টাকা পাওনা হয়ে গেছে আমার।'

'বাক', শান্তকণ্ঠে বলল রিক, 'ছেলেগুলোকে যদি এতই ভয় তোমার, সেটা আমাদের না শুনিয়ে যাও না, গিয়ে খতম করে দাও। ল্যাঠা চুকে যাক।'

'এই লোকগুলো আমার মাথা গরম করে দিচ্ছে', বিড়বিড় করে বলে সোজা হয়ে দাঁড়াল রবিন। 'আমি ভেতরে যাচ্ছি।'

ভাবাবেগকে প্রশ্রয় দিয়ে ফেলেছে রবিন, তবে বাধা না দিয়ে কিশোরও ওর পেছন পেছন চলল। যদি ওই শয়তান লোকগুলো ভেবে থাকে, ক্যানারি আইল্যান্ডকে দখল করে এখানকার মানুষের জীবনযাত্রা ধ্বংস করে দেবে, কেউ কোনো বাধা দেবে না, কিংবা দিয়ে কিছু করতে পারবে না, তাহলে মস্ত ভুল করছে ওরা, বোকার স্বর্গে বাস করছে।

কারাতে কিক মেরে এক লাথিতে দরজাটা খুলে ফেলল রবিন। কিশোরও অ্যাকশনের জন্য তৈরি করে ফেলেছে নিজেকে। ঝটকা দিয়ে পাল্লাটা খুলে গেল, ওটার ওপরের দিকে লাগানো কাচ ঝনঝন করে ভেঙে পড়ল। ভেতরে তাকিয়ে যা দেখল, তাতে আতঙ্কে রক্ত জমে যেন বরফ হয়ে গেল কিশোরের।

সামনেই দেখতে পেল মুসাকে। বেঁধে রাখা হয়েছে অ্যান্টিক পুলির ভেতর দিয়ে চলে যাওয়া মস্ত এক লোহার শিকলের সঙ্গে, যেটা দিয়ে আদিম ক্রেনটা চালানো হতো। মুসার আতঙ্কিত দৃষ্টি বারবার চলে যাচ্ছে ছাদের দিকে, বিশ ফুট ওপরে, যেখানে রয়েছে বিশাল গিয়ারগুলো, যেগুলোর সাহায্যে পুলিটাকে ঘোরানো হতো আর যেগুলোর মারাত্মক দাঁতগুলো যেন মুসাকে চিপে মারার অপেক্ষা করছে।

'মেশিনটা দেখতে পুরোনো মনে হলে কী হবে', রিগার বলল, 'এখনো এটা খুব নিখুঁতভাবে কাজ করে।' একটা হান্টিং রাইফেল তুলে নিয়ে তাক করল কিশোর ও রবিনের দিকে। 'এতই নিখুঁত, একটা মানুষকে কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে ভর্তা করে দিতে পারে। সেটারই চাক্ষুষ প্রমাণ দেব আমি তোমাদের।'

বলে, রাইফেলটা রিকের হাতে দিয়ে, কাছেই বসানো কন্ট্রোল লিভারটার হাতল চেপে ধরল রিগার। 'নিশ্চিন্তে এখন তোমাদের বন্ধুকে গুডবাই জানাতে পারো, বিচ্ছুরা।'

ষোলো

বরফের মতো জমে গিয়ে যেন দাঁড়িয়ে আছে কিশোর ও রবিন, রাইফেলটার দিকে তাকিয়ে, যেটা ওদের

দিকে তাক করে রেখেছে রিক বেরিং। লিভার ধরে ঠেলা দিল রিগার। ঝনঝন করে চালু হয়ে গেল লোহার তৈরি আদিম যন্ত্রটা। আতঙ্কে চিৎকার করে উঠল মুসা, মুখে কাপড় গোঁজা থাকায় গোঁ গোঁ শব্দ হলো শুধু। ইঞ্চি ইঞ্চি করে ওপরে উঠতে লাগল শিকলের কড়াগুলো। বিশ্রী ক্যাঁচকোঁচ শব্দ করছে। তুলে নিয়ে যাচ্ছে মুসাকে। ক্রমেই নিয়ে যাচ্ছে ভয়ানক দাঁতগুলোর কাছে।

'ঠান্ডা মাথায় মানুষ খুন করছেন আপনি!' চিৎকার করে বলল রবিন।

কুৎসিত হাসি ফুটল রিগারের মুখে। 'শেরিফ এখন আমাদের সঙ্গে থাকায় সুবিধেই হয়েছে', বলল ও। 'তোমাদের বন্ধু দুর্ঘটনায় মারা গেছে, পুলিশের কাছে ও রিপোর্ট করলে সেটা গ্রহণযোগ্য হবে। বিশেষ করে তোমরা দুজন যেহেতু প্রতিবাদ করার জন্য বেঁচে থাকবে না। তোমাদের পায়ে ভারী পাথর বেঁধে পুকুরটাতে ডুবিয়ে দেওয়া হবে। কেউ কোনো দিন জানতে পারবে না কোথায় আছো তোমরা।'

মুসার পা দুটো শূন্যে ঝুলে থেকে মরিয়া হয়ে ঝাঁকি দিচ্ছে। ওর হাত আর কোমর শক্ত করে দড়ি দিয়ে বাঁধা হয়েছে শিকলের সঙ্গে।

হঠাৎ চেঁচিয়ে বলল রবিন, 'বুদ্ধিটা খুব ভালোই বের করেছ, মুসা!'

কথাটায় কাজ হলো। সঙ্গে সঙ্গে রাইফেল তাক করে থাকা রিকের চোখ ঘুরে গেল মুসার দিকে। সুযোগটা কাজে লাগাতে ব্যর্থ হলো না রবিন। মুহূর্তে লাফ দিয়ে গিয়ে রাইফেলের নল চেপে ধরে ওপর দিকে ঠেলে দিল। টান দিয়ে ছাড়াতে গিয়ে ট্রিগারে আঙুল বসে গেল রিকের। প্রচণ্ড শব্দে ফুটল বুলেট, প্রতিধ্বনি ছড়িয়ে পড়ল চতুর্দিকে। পুরোনো ছাদে গিয়ে লাগল গুলিটা।

কিশোরও বসে নেই। জুজিৎসুর প্যাঁচে আটকে ফেলল রিগারকে। একই সঙ্গে ডান পা দিয়ে লাথি মারল বাকের বুকে। একটা জরুরি মুহূর্তের জন্য অকেজো করে দিল শেরিফকে।

রাইফেলের ধাক্কা হজম করতে একটা মুহূর্ত সময় লাগল রিকের, এই সুযোগে কনুই দিয়ে ওর সোলার প্লেক্সাসে প্রচণ্ড গুঁতো মারল রবিন। ভয়ানক ব্যথায় রাইফেলের ওপর আঙুল ঢিল হয়ে গেল রিকের, টান দিয়ে সেটা কেড়ে নিল রবিন। কিছুটা সামলে নিয়ে রাইফেলটা ধরতে এল বাক, আবার লাথি খেল কিশোরের, এবার ঠিক পেটের মাঝ বরাবর। ব্যথা পেয়ে সামনের দিকে বাঁকা হয়ে গেল শেরিফের দেহটা। সেদিকে তাকানোর সময় নেই। আচমকা রিককে ছেড়ে দিয়ে ওর নাকে-মুখে কনুই চালাল কিশোর।

যন্ত্রণায় চেঁচিয়ে উঠে অন্ধের মতো কিশোরের মুখ লক্ষ্য করে ঘুসি মারতে চাইল রিক। ঝট করে মাথা নামিয়ে ফেলল কিশোর। সেই নামানো মাথা দিয়েই গুঁতো মারল রিকের পেটে। পেছনে ছিটকে পড়ল রিক। মাথাটা বাড়ি খেল ক্রেনের ধাতব কন্ট্রোল বক্সের গায়ে। বেহুঁশ হয়ে গেল।

ওপর থেকে মুসার গোঁ গোঁ শব্দ শোনা গেল। ওপরে তাকিয়ে কিশোর দেখল, মুসার মাথাটা দাঁতওয়ালা চাকাগুলোর মাত্র দুই ফুট দূরে রয়েছে। ভয়ংকর মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলেছে মুসা। মেশিনটা পুলিটাকে ঘুরিয়েই চলেছে।

অবশেষে রাইফেলটা রবিনের হাতে চলে এল। আর ঠিক সেই মুহূর্তে সামলে নিয়ে ঝাঁপ দিল বাক। রবিনকে নিয়ে পড়ল মেঝেতে। ট্রিগারে টান লেগে আরেকবার গুলি ফুটল। এবার গুলিটা গিয়ারের ধাতব চাকার গায়ে বাড়ি লেগে তীক্ষ্ণ শব্দ তুলে বেরিয়ে গেল। অল্পের জন্য মুসার গায়ে লাগেনি গুলিটা। ধস্তাধস্তির একপর্যায়ে রবিনের হাত থেকে রাইফেলটা ছুটে গিয়ে মেঝের ওপর দিয়ে পিছলে চলে গেল ঘরের একটা অন্ধকার জায়গায়। কোথায় আছে ওটা খুঁজতে লাগল রবিনের চোখ, কিন্তু রাইফেলটা দেখার আগেই রবিনকে কাবু করার জন্য বাকের সঙ্গে যোগ দিল এসে রিক।

দুই হাতে রিকের দেহের যত্রতত্র ঘুসি মারতে লাগল রবিন, মুখে, বুকে, পেটে। বাক উঠে গিয়ে একটা শাবল তুলে নিল। বাড়ি মেরে রবিনের খুলি গুঁড়িয়ে দেবে। সেটা দেখে লাফিয়ে এসে পড়ল কিশোর। শেরিফের হাতের কব্জিতে প্রচণ্ড এক কারাতে কিক মারল। লাথি খেয়ে ব্যথায় চিৎকার করে উঠল শেরিফ। কব্জি ভেঙে গেছে। হাত থেকে শাবলটা পড়ে গেল। অন্য হাত দিয়ে চেপে ধরল ভাঙা কব্জি। থামল না কিশোর। ওর ঘাড়ে কারাতে চপ মারল, অর্থাৎ হাতের একপাশ দিয়ে দা দিয়ে কোপানোর মতো করে আঘাত করল ওর। জ্ঞান হারিয়ে পড়ে গেল

শেরিফ। রবিনকে সাহায্য করার জন্য ঘুরল কিশোর। তবে রবিনের সাহায্যের আর প্রয়োজন নেই। রিকের দলামোচড়া হয়ে পড়ে থাকা দেহটার ওপর বসে হাঁপাচ্ছে ও।

'ক্রেন!' আচমকা চিৎকার করে উঠল কিশোর। ওপর দিকে তাকাল। চাকার দাঁত থেকে আর মাত্র কয়েক ইঞ্চি দূরে রয়েছে মুসা।

লাফ দিয়ে গিয়ে লিভার ধরে হ্যাঁচকা টান মেরে যত দূর যায় নামিয়ে দিল রবিন। ওকে সাহায্য করতে ছুটে গেল কিশোর। দুজনে মিলে চেষ্টা করে শেষ মুহূর্তে যন্ত্রটাকে থামিয়ে দিল। ক্যাঁচকোঁচ, ঝনঝন, নানা রকম শব্দ তুলে চাকাগুলো থামতেই ঝাঁকি দিয়ে থেমে গেল শিকলটাও।

'হউফ!' করে মুখ দিয়ে বাতাস ছাড়ল রবিন। টলতে টলতে পিছিয়ে গেল। দম টানছে ঘন ঘন। 'অল্পের জন্য বাঁচল!'

'ভাবছি, হাতলটাকে উল্টো দিকে ঠেলে দেখলে কেমন হয়', কিশোর বলল।

'না না, ওসব পরীক্ষা-নিরীক্ষার দরকারই নেই!' বাধা দিল রবিন। শিকলের কড়া বেয়ে ওপরে উঠতে লাগল ও। ওর সুইস আর্মি নাইফের ফলাটা দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরেছে। মুসার কাছে পৌঁছে ছুরি দিয়ে কেটে দিতে লাগল ওর দড়ির বাঁধন। কাটা হয়ে গেলে দুজনে মিলে আবার শিকল বেয়ে নিচে নেমে এল। মাটিতে পড়ে থাকা তিন অপরাধীর দিকে তাকাল কিশোর। রিক আর রিগার এখনো বেহুঁশ। বাক এক কোণে পড়ে পড়ে ব্যথায় কাতরাচ্ছে আর জোরে জোরে দম নিচ্ছে। নিচু হয়ে ঝুঁকে ওর কোমর থেকে হাতকড়াটা খুলে নিল কিশোর, বাধা দিল না বাক, দেওয়ার অবস্থা নেই আর ওর। ওর দুই হাতে হাতকড়া পরিয়ে দিয়ে কিশোর বলল, 'অনেক ধন্যবাদ, বাক, এটা সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন বলে।'

কিশোরের পাশে এসে দাঁড়াল মুসা ও রবিন। কব্জি ডলছে মুসা, চামড়ায় দড়ির দাগগুলো ফুলে উঠেছে। 'ওই শিকলে ঝুলে ওঠার সময় জন্মের ভয় পেয়েছিলাম আমি!' ওপরে তাকিয়ে গিয়ারের দাঁতগুলোর দিকে তাকিয়ে কেঁপে উঠল ও। 'ধরেই নিয়েছিলাম, মরে গেছি!'

'তা আর যাবে কী করে?' হেসে বলল রবিন। 'তোমারও তো আমাদের মতোই বিড়ালের জান।' আড়চোখে বাকের দিকে তাকাল ও।

'এখানেই কোনখান থেকে গুলির শব্দ হয়েছে!' বাইরে থেকে শোনা গেল একটা মহিলা কণ্ঠ। দরজার কাছে গিয়ে কিশোর দেখল পলি আর তার অ্যাকর্ন সোসাইটির সদস্যরা সব হাজির হয়ে গেছে। কিশোরকে দেখে জিজ্ঞেস করল পলি, 'কী ব্যাপার, কী হচ্ছে এখানে?'

'মুসাকে খুঁজে পেয়েছি আমরা, ক্যানারি আইল্যান্ডের রহস্যও ভেদ করে ফেলেছি', কিশোর বলল। 'আসুন, ভেতরে আসুন। সব দেখতে পাবেন।'

*

অপরাধীদের শহরে নিয়ে আসা হলো। খবর পেয়ে দ্বীপের সব লোক এসে ভিড় করল। সবার মত নিয়ে বাক ও আইআরসি কোম্পানির দুই প্রতিনিধিকে গ্রেপ্তারের ব্যবস্থা করলেন মিস্টার গিলবার্ট ও পলি বার্জেন মিলে। জাহাজঘাটায় এনে হাতকড়া পরিয়ে একটা জাহাজ বাঁধার শিকলের সঙ্গে আটকে রাখা হলো তিনজনকে। আবহাওয়া পরিষ্কার হলো। মেইনল্যান্ডে পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করে ওদেরকে এসে অপরাধীদের নিয়ে যেতে বলা হলো। ওদের আসতে ঘণ্টা দুয়েক লাগবে। ওই সময়টা দ্বীপের কয়েকজন লোক পালা করে পাহারা দেবে তিনজনকে, কোনোমতেই যাতে পালাতে না পারে ওরা।

'আজ রাতে আমার সরাইখানায় আমার নিজের খরচে ডিনার খাওয়াব', পুলিশের বোট এসে তিন অপরাধীকে তুলে নিয়ে যাওয়ার পর জনতার উদ্দেশে জোরে জোরে বললেন মিস্টার গিলবার্ট। 'ক্যানারি আইল্যান্ডের সবাইকে আমার দাওয়াত। আরেকটা কথা, আজকের মেনুতে শুধুই নিরামিষ থাকবে', হেসে বলে, পলি বার্জেনের দিকে তাকিয়ে চোখ টিপলেন তিনি।

খুশি হলো পলি। হাসিটা ফিরিয়ে দিয়ে সন্তুষ্টির ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল। 'শিখতে আরম্ভ করেছেন আপনি, মিস্টার গিলবার্ট। শিখতে আরম্ভ করেছেন।'

'গোসল করতে হবে আমাকে', হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে ভুরুর ওপরের ঘাম মুছে কিশোরকে বলল রবিন।

'আমিও করব', জবাব দিল কিশোর। 'গরম পানি দিয়ে।'

'আমার খিদে পেয়েছে', মুসা বলল। 'দুপুরে কিছু খাইনি। এত ভালো বিস্কুটগুলোও নষ্ট করেছি ওই শয়তানগুলোর পেছনে।'

হেসে উঠল কিশোর ও রবিন। এমিলির বাড়িতে রওনা হলো। হক'স হিল রোড ধরে যখন পাহাড় বেয়ে ওপরে উঠছে, পশ্চিম দিগন্তে কালো মেঘের ফাঁকে তখন সূর্য উঁকি দিল। পুবের আকাশে উজ্জ্বল রামধনু সৃষ্টি করল সূর্যের আলো। তার মানে ঝড় কেটে গেছে। ক্যানারি দ্বীপ আর এর সৌন্দর্য নিরাপত্তা পেল আরেকবার।

গোসল সেরে, পোশাক পরে তরতাজা হয়ে আবার শহরে ফিরে এল তিন বন্ধু। খাওয়ার জন্য, পার্টির জন্য তৈরি। মিস্টার গিলবার্টের দাওয়াতের কথা বোধহয় জানাজানি হয়ে গেছে। কারণ, দ্বীপের প্রায় সবাইকে হাজির দেখা গেল ওখানে। কিশোররা ডাইনিংরুমে ঢোকার পথে একে একে তিনজনের পিঠ চাপড়ে দিয়ে স্বাগত জানালেন ক্যানি। ওদেরকে দরজায় দেখে হাততালিতে ফেটে পড়ল দ্বীপবাসীরা। ওদেরকে এত সম্মান দেখানোয় কিছুটা বিব্রতই বোধ করতে লাগল কিশোর, মুসা, রবিন।

'ক্যানারি আইল্যান্ডকে মুক্ত করার জন্য তোমাদেরকে একটা অ্যাকর্ন সোসাইটি পুরস্কার দিতে চাই আমি', দরজার কাছ থেকে ছেলেরা ভেতরে এগোলে পলি বলল। কাঠ খোদাই করে তৈরি করা দুটো ওকের বীজ ওদের হাতে তুলে দিল ও। বলল, 'আর ভয় নেই, বনের জ্যান্ত গাছগুলোকে আর কোনো হানাদার এসে কাটতে পারবে না। এমনকি দ্বীপের লোকেও কাটবে না—আমাকে কথা দিয়েছে—যদি নিয়মিত লাকড়ি পায়। আমি বাইরে থেকে এনে ওদেরকে সেই লাকড়ি সাপ্লাই দেব।'

হঠাৎ জোরাল গুঞ্জন বয়ে গেল ডাহানংরুমে। দরজার দিকে ফিরে তাকাল কিশোর। কলি জেসন এসেছেন। তাঁর তুষারশুভ্র চুলগুলোকে মাথার ওপরে ঝুঁটি করে বেঁধেছেন। ঠোঁটে লাগিয়েছেন গাঢ় লাল লিপস্টিক। হাতে একটা ছবি।

'ডিনারে থাকতে পারব না আমি', ঘরে ঢুকে জানালেন তিনি। 'আমার কুকুরগুলোকে ফিরিয়ে দিয়ে গেছে বুস্টার। আমি ওকে কথা দিয়েছি, আর ওগুলোকে কষ্ট দেব না। কুকুরগুলোকে দেখাশোনার ভারও আমি ওর ওপর দিয়েছি।' কিশোরদের কাছে এসে বললেন, 'ওর কাছেই সব শুনলাম। তাই এই ছবিটা তোমাদেরকে উপহার দিতে এনেছি।'

ছবিটা বাড়িয়ে দিলেন তিনি। একসঙ্গে সেটা ধরল কিশোর, মুসা ও রবিন। জলরঙে আঁকা ক্যাথেড্রাল ফরেস্টের একটা অতি চমৎকার ছবি। মোলায়েম রং দিয়ে আঁকা ভোরের দৃশ্যটা যেন জ্যান্ত হয়ে ফুটে উঠেছে। তাকিয়ে আছে কিশোর। অসাধারণ একটা শিল্পকর্ম।

'কী সুন্দর! অনেক ধন্যবাদ আপনাকে', রবিন বলল। ঘরের সবাই ঘিরে ধরল ওদেরকে, ছবিটা দেখার জন্য। সবাই প্রশংসা করতে লাগল।

সামনে এগিয়ে এলেন মিস্টার গিলবার্ট। 'সবাই তোমাদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছে', বললেন তিনি, 'আমিই বা বাদ থাকি কেন? তাই সবার সঙ্গে গলা মিলিয়ে আমিও তোমাদের ধন্যবাদ জানাই। এই সরাইখানাটা এখন থেকে তোমাদের নিজের বাড়ির মতো মনে করবে। যখনই মনে হবে, শহুরে জীবনে অতিষ্ঠ হয়ে গেছ, নিরালা কোনো শান্তির জায়গায় থাকতে চাও, আমাদের কথা মনে কোরো, সোজা চলে এসো ক্যানারিতে। আশা করি, এবারকার মতো আর ভুগতে হবে না তোমাদের!'

সবাই চিৎকার করে, হাততালি দিয়ে, সমর্থন জানাল মিস্টার গিলবার্টকে। বুস্টারকে ঢুকতে দেখে থেমে গেল। পরিষ্কার পোশাক পরেছে ও। গায়ের সাদা শার্টটা ইস্তিরি করা। কাজের পোশাক ছাড়া অন্য কোনো পোশাকে কখনো ওকে দেখেনি কিশোররা।

গম্ভীর মুখে কাছে এসে বুস্টার বলল, 'বক্তৃতা-টক্তৃতা আমি দিতে পারি না, তবু আজ কিছু বলার চেষ্টা করব। বাক উইনারের মতো পিশাচের হাত থেকে এই ছেলেগুলো আমাদের যেভাবে রক্ষা করেছে, ওদের ধন্যবাদ জানানোর ভাষা আমার জানা নেই। তবে একটা কাজ আমি করব, সেটাই হবে আমার ধন্যবাদ জানানো, আর সেটা হলো ওরা যখন চলে যাবে, পাহাড়ের ওপরের বাড়ি থেকে ওদের মালপত্রগুলো নামিয়ে এনে বোটে তুলে দেওয়ার জন্য আমি কোনো পয়সা নেব না, একটা আধলাও না।' হঠাৎ হাসি ফুটল বিশালদেহী লোকটার মুখে। তারপর খপ করে রবিনের হাতটা ধরে এত জোরে ঝাঁকাতে লাগল, চোখমুখ কুঁচকে ফেলল রবিন, যদিও না হেসে পারল না ও।

'থ্যাংকস, বুস্টার', ঝাঁকি দেওয়ার নামে কিশোরের হাত চিপা শুরু হলে রবিনের মতোই চোখমুখ কুঁচকে ফেলল ও। 'আপনার হৃদয়টা অনেক বড়।'

'ও কিছু না', বলে মুসার দিকে হাত বাড়াল বুস্টার। 'আবার যদি কোনো দিন এখানে বেড়াতে আসো, পাহাড়ের ওপর মাল পৌঁছে দেওয়ার জন্যও কোনো পয়সা নেব না।'

তাড়াতাড়ি মুসা হাতটা সরিয়ে নেওয়ার আগেই ধরা পড়ে গেল বুস্টারের হাতে। বুস্টার তাতে চাপ দেওয়ার আগেই চোখমুখ কুঁচকে 'আঁউ!' করে উঠল। হেসে উঠল সবাই। সচকিত হয়ে মুসার হাতে আলতো করে চাপ দিল বুস্টার।

'ও, একটা সুখবর আছে', মিস্টার গিলবার্ট বললেন, 'দ্বীপের সবাই আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি, ক্যানারি আইল্যান্ডের সমস্ত বুনো অঞ্চল স্টেট কনজারভেন্সি ট্রাস্টের হাতে তুলে দেব আমরা। তাতে একটা বিষয়ে নিশ্চিন্ত হওয়া যাবে, জায়গাটা রাষ্ট্রের দায়িত্বে চলে গেলে কখনো কোনো দুষ্ট লোক এসে আর চালাকি করে দখল করতে পারবে না।'

ঘরের সবাই আনন্দে হই-হই করে উঠল। তবে মুসার চেয়ে জোরে কেউ হাততালি দিতে পারল না।

'একটা জিনিস কেউ নষ্ট করতে পারবে না', ঘরে জড়ো হওয়া চারপাশের হাসিমুখগুলোর দিকে তাকিয়ে বলল, 'ক্যানারি দ্বীপের মানুষের আন্তরিকতা।'

'দ্বীপটা আরেকটু হলেই ধ্বংস করে দিয়েছিল', জনতার সামনে দাঁড়িয়ে বললেন ক্যানি, 'সফলও হয়ে গিয়েছিল প্রায়—এই ছেলেগুলো বাধা হয়ে না দাঁড়ালে।'

আরও একবার হুল্লোড় করে কিশোর মুসা রবিনকে ধন্যবাদ দিল জনতা।